জীবন বেদ

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

জীবন বেদ (JiivanVeda)

© ২০১৩ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিষ্টার্ড অফিসঃ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ,
আনন্দনগর,পোষ্ট — বাগলতা, জেলা – পুরুলিয়া , পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ৫২৭ , ভি.আই.পি.নগর , কলকাতা –৭০০১০০

প্রথম প্রকাশ : আনন্দ পূর্নিমা ১৯৫৭, জামালপুর

দ্বিতীয়ত সংস্করণ : ২৬শে নভেম্বর ১৯৬৩

তৃতীয় সংস্করণ : ৭ই মার্চ ১৯৬৯

চতুর্থ সংস্করণ : ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

পঞ্চম সংস্করণ : ১৪ই নভেম্বর ১৯৮৭

ষষ্ঠ সংস্করণঃ ১লা জানুয়ারি ১৯৯১

দশম মুদ্রাঙ্কনঃ ২৩ শে জানুয়ারী ২০১৩

প্রকাশক: আচার্য সুগতানন্দ অবধূত(কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব)
৫২৭ ভি.আই.পি.নগর , কলকাতা –৭০০১০০

মুদ্রাকর: আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি,
মোহনবাগান লেন , কলকাতা –৭০০০০৪

ডিজিটাল সংস্করণ : আচার্য সত্যবোধানন্দ অবধূত, ডিসেম্বর ২০২১

ISBN : 978-81-7252-295-4

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম–নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম–নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প	ফ	ব	ভ	ম
प	फ	ब	भ	म
Pa	pha	ba	bha	ma

য	র	ল	ব
य	र	ल	व
ya	ra	la	va

শ	ষ	স	হ	ক্ষ
श	ष	स	ह	क्ष
sha	śa	sa	ha	kśa

অ	জ্ঞ	ঋষি	ছায়া	জ্ঞা	সংস্কৃত	ততোঽহং
अँ	ज्ञ	ऋषि	छाया	ज्ञान	संस्कृत	ततोऽहं
aṋ	jiṋa	rśi	cháya	jiṋána	saḿskrta	tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ
n ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

সূচীপত্র

১) যম - সাধনা 9

২) অহিংসা 9

৩) সত্য 23

৪) অস্তেয় 25

৫) ব্রহ্মচর্য 30

৬) অপরিগ্রহ 35

৭) সমাজে কী ভাবে থাকতে হবে 38

৮) নিয়ম - সাধনা 40

৯) শৌচ 41

১০) সন্তোষ 46

১১) তপঃ 49

১২) স্বাধ্যায় 53

১৩) ঈশ্বর-প্রণিধান 55

জীবন - বেদ

সাধনার ভিত্তিভূমি নৈতিকতা । প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে এই নৈতিকতা (morality) সাধকের চরম লক্ষ্য (ultimate goal) নয় , আর এই নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা মর‍্যালিষ্ট হওয়া সাধকের জীবনে এমন কোন একটা অবস্থা নয় যা ' অন্য কারুর চরম আদর্শ হ'তে পারে । সাধনামার্গে যাত্রা শুরু করবার ঠিক প্রথম ক্ষণটিতেই সাধকের যে মানসিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন সেটারই নাম নৈতিকতা বা মর‍্যালিটি ।

অনেককে হয়তো বলতে শুণেছ যে আমি ধর্ম – কর্ম ৰুঝি না , সৎপথে থাকৰ , কারও ক্ষতি করৰ না , মিথ্যে ৰলৰ না , — ব্যস এইটেই যথেষ্ট , এর বেশী কিছু কববার বা শেখবার প্রয়োজন দেখি না । নৈতিকতা জিনিসটাই হচ্ছে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের প্রচেষ্টা । এটাকে ঠিক স্থির শক্তি না ৰলে চলচ্ছক্তি ৰলাই অধিকতর সঙ্গত , কারণ এতে প্রতি মুহূর্তেই নিজের অন্তঃস্থ বিরোধী ভাবগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ' বাইরের সাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে । এটা কোন অন্তস্থ – বহিঃস্থ উভয়তঃ সাম্যাবস্থা নয় । অন্তরের

অসাম্য বাইরের প্রলোভনে পড়ে ’ গুরুতর আকার ধারণ করলে পরে মানসিক বিকৃতি যদি উগ্রভাবে দেখা দেয় তখন লড়বার অন্তর্নিহিত শক্তিটুকু পরাভূত হয়ে ’ যেতে পারে , যার ফলে বাইরেকার সাম্য বা বাইরেকার লোক – দেখানো নৈতিকতা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গেচুরে ’ যেতে পারে ।

তাই নীতিবাদ কোন লক্ষ্য তো নয়ই, কোন একটা স্থির শক্তিও নয় । যে কোন মুহূর্তে নীতিবাদীর নীতি নষ্ট হয়ে ’ যেতে পারে । যে নীতিবাদী দু’টাকা ঘুষের লোভ সংবরণ করতে পারল সে যে দু’লাখ টাকা ঘুষের লোভও সামলাতে পারবে এমন কথা হলপ করে ’ বলা যায় না । তবু ৰলৰ , মানুষের জীবনে নীতিবাদ জিনিসটা একেবারেই মূল্যহীন নয় ; নীতিবাদ সৎ নাগরিকের লক্ষণ , নীতিবাদ সাধনামার্গে যাত্রাপথের প্রারম্ভ – বিন্দু ।

নৈতিক আদর্শগুলো এমনধারা হওয়া উচিত যাতে করে মানুষ সাধনমার্গে চলবার সামর্থ্যও পায় , প্রেরণাও পায় । নীতিবাদ জিনিসটা যখন দেশ – কাল – পাত্রের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল তখন আপাতঃদৃষ্টিতে তাতে দৈশিক , কালিক ও পাত্রিক বিভিন্নতা থাকা হয়তো সম্ভব , কিন্তু নীতিবাদের যেটা চরম কথা সেটা হ’ল ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি , আর তাই তাতে আপেক্ষিকতার দোষ থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয় । চুরি না করাই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয় , চুরি করবার প্রবৃত্তি নষ্ট হওয়াই চরম কথা ; মিথ্যা না

বলাই চরম কথা নয় , মনের থেকে মিথ্যা ভাব বিদূরিত হওয়াই সব চাইতে বড় কথা । সাধকের যাত্রাপথ শুরু হয় এই চুরি না – করা বা মিথ্যা না – ৰলা ভিত্তিক নীতিবাদের ওপর , আর এই নীতিবাদের চরম লক্ষ্য থেকে যাচ্ছে চুরির ইচ্ছা না থাকা ভাব বিদূরিত হওয়া – ভিত্তিক ব্রাহ্মী স্থিতিতে ।

আনন্দমার্গের সাধনাতে এই ব্রাহ্মী আদর্শকেই সামনে রেখে ’ প্রথমে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে , কারণ নীতিশিক্ষা ব্যতিরেকে সাধনা অসম্ভব । নীতিবর্জিত সাধনা মানুষকে বার বার ভোগের দিকে ঠেলে ’ ফেলে ’ দিতে চাইৰে ও যে কোন মুহূর্তে তার কষ্টার্জিত মানস শক্তি ক্ষুদ্র ভোগসিদ্ধির জন্যে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হ’তে পারে । যোগভ্রষ্ট বা তন্ত্রভ্রষ্ট অজস্র ব্যষ্টির জীবন এই রকমধারা কলঙ্কেই মসীলিপ্ত হ’য়ে রয়েছে । জোর – জবরদস্তি করে ’ প্রবৃত্তি দমন করে ’ তারা যা ’ যৎসামান্য সম্পদ অর্জন করেছিল , ভোগের তাড়নায় এক মুহূর্তের ভুলেই তারা তার সবটুকুই খুইয়ে ’ বসেছে । তাই ৰলি , সাধনা আরম্ভ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তটিতে সন্নীতি গ্রহণ করতে হবে । যে নীতি গ্রহণে পরাঙ্মুখ সে যেন সাধনামার্গে এসে ’ নিজের ও দেশের অকল্যাণ ডেকে ’ না আনে ।

তোমরা আচার্যরা এমন ঘটনা নিশ্চয়ই দেখেছ যে স্বার্থান্ধ লোকেরা এই নীতি মানবার ভয়ে আনন্দমার্গকে ভয়

পায় । নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে অসুবিধে হবে ভেবে ’ মার্গের প্রচারে শঙ্কিত হয়ে পড়ে ও নিজের অসাধুতা বা দুর্বলতা সযত্নে ঢেকে ’ রাখার প্রয়াসে মার্গের নিন্দা করে । কিন্তু তোমরা জেনে রেখো , যে নীতিজ্ঞানবিবর্জিত সে মনুষ্য নাম ধারণের অযোগ্য । সে যতই চেষ্টা করুক , নিজের মনের পঙ্কিলতা ৰড় ৰড় কথার জালে বেশী দিন ঢেকে ’ রাখতে পারবে না ।

সূচীপত্র

1 যম - সাধনা

নীতিবাদের প্রথম শিক্ষা হ’ল যম – সাধনা । এই যম – সাধনার প্রতিটি অঙ্গ সম্বন্ধে আজ সংক্ষেপে কিছুটা ৰলৰ । তোমরা জান যমের অঙ্গ পাঁচটি— “অহিংসা – সত্যাস্তেয় – ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ।” অহিংসা , সত্য , অস্তেয় , ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এই পাঁচটি অঙ্গই বিভিন্ন ভাবে সাধককে সংযম শিক্ষা দেয় । তোমরা নিশ্চয়ই জান , ‘ সংযম ’ শব্দের অর্থ হ’ল নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার । এ কথা স্পষ্ট করে ’ মনে রেখো , সংযম মানে কোন কিছুকে হত্যা বা নষ্ট করা নয় ।

সূচীপত্র

2 অহিংসা

“ মনোবাক্কায়ৈঃ সর্বভূতানামপীড়নমহিংসা । ”

মন , বাক্য ও শরীরের দ্বারা কারও ওপর পীড়ন না করার নামই অহিংসা ।

এই ‘ অহিংসা ’ শব্দের অর্থ নিয়ে অনেকেই নানান্ রকমের ভুল করে ’ বসে । কোন কোন পণ্ডিত ‘ অহিংসা ' শব্দের এমন ধারা ব্যাখ্যা করে ’ থাকেন যাকে যথাযথভাবে রূপ দিতে গেলে ঘর – সংসারে বাস করা তো দূরের কথা , ৰনে – জঙ্গলে পর্বত – কন্দরে বাস করাও অসম্ভব । এই জাতীয় অর্থ অনুযায়ী ' অহিংসা ’ মানে কাউকে হত্যা করা তো চলৰেই না , শত্রুকে আঘাত করাও চলবে না । ভূ – নিম্নস্থ কীটাদির মৃত্যু – সম্ভাবনা থাকায় হলাকর্ষণও চলৰে না । এঁরা বিধান দেন , ধর্মজীবন যাপনেচ্ছু ব্যক্তি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকবার উদ্দেশ্যে নিজে হলাকর্ষণ না করে ’ শূদ্রকে দিয়ে ’ কৃষিকার্য করাবে । মানুষ খেতে পাক বা না পাক , পিঁপড়ের গর্ভে চীনী ঢেলে ’ দিতে হৰে অথবা

মনুষ্যের জাতশত্রু মৎকুনকুলকে বাঁচাবার জন্যে সুস্থ দরিদ্রের দেহ থেকে রক্তমোক্ষণ করতে হবে ।

তোমরা জেনে ’ রেখে ’ দাও , এটা অহিংসার ব্যাখ্যা নয়— অপব্যাখ্যা , এটা বাস্তব ধর্মবিরোধী— জৈব ধর্মবিরোধী । তোমার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অজস্র জীবাণুর আগমন – নির্গমন হচ্ছে তারাও সকলে জীবিত প্রাণী , তাদের বাঁচাবার স্বার্থে তাহলে তোমাকে শ্বাস – প্রশ্বাস ক্রিয়াও ছেড়ে দিতে হয় , রোগসঞ্জাত বিভিন্ন প্রকারের বিষবাহী অণুজীব সমূহকে শরীর থেকে তাড়াবার জন্যে ঔষধ সেবনও ৰন্ধ করে দিতে হয় । অহিংসার এই রকম অর্থটি নিতে গেলে এই তথাকথিত অহিংসার প্রবক্তারা দাঁড়াবেন কোথায় ৰল তো ! বিশুদ্ধ জলপান ত্যাগ করতে হবে তাঁদের , কারণ জলের বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়ায় বহু দূষিত জীবাণুর মৃত্যু ঘটে ’ থাকে । তাঁদের অবিশুদ্ধ জলও ত্যাগ করতে হবে , কারণ মানুষের উদরে গিয়ে ’ অপরিচ্ছন্ন জলের কীটাণুসমূহের হয়তো মৃত্যু ঘটৰে ।

এই জাতীয় অহিংসা বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন ধরে ’ প্রচারিত হ’ত যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠেছিল । অহিংসাকেন্দ্রিক ধর্মকে জনসাধারণ বেশ ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিল ও শেষ পর্যন্ত ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নাস্তিকতাবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল । যারা নাস্তিক হয়েছিল সেই নীতিজ্ঞানবিবর্জিত

ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক মানুষগুলো সমাজের তথা জগতের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । আর যারা এই তথাকথিত অহিংসাকেন্দ্রিক ধর্মকে জোর করে ’ আঁকড়ে ’ ধরে ’ থাকতে চেয়েছিল তারা বাস্তবতাবিমুখ ক্লীবোচিত স্বভাবযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকের দিনে অতীতের এ ঐতিহাসিক তথ্যটুকুকে নতুন করে ’ চিন্তা করে ’ দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে ।

এর পরে আরও একটা যুগ এসেছিল যখন জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার আরও নূতন রকমের ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছিল । এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীবকে যে কোন প্রকারের ক্লেশ দেওয়াই হিংসা বটে কিন্তু খাদ্যার্থে পশুহত্যা হিংসা বলে ’ গণ্য নয় । এখানেও বিচারে মস্ত ৰড় গলদ রয়ে ’ গেছে । ক্লেশ দেওয়া মাত্রকেই যদি হিংসা ৰলি তাহলে খাদ্যর্থে পশুহত্যা নিশ্চয়ই হিংসা পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে , কারণ সেক্ষেত্রে পশু নিশ্চয়ই হাসিমুখে যূপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে ’ দেয় না ।

আজকালকার দিনে অহিংসার আরও একটা নবতর ব্যাখ্যা শোণা যায় যা ’ কতকটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরই পর্যায়ভুক্ত । তবে দ্বিতীয়টিতে যে সরলতা বা নিষ্ঠার পরিচয় আছে এটিতে তাও নেই । এতেও অহিংসার মানে ধরা হয় শক্তির অপ্রয়োগ (non - violence) । এ জাতীয় ব্যাখ্যাতেই হয়তো ' অহিংসা ' শব্দের সব চাইতে কদর্থ

করা হয়েছে । জগতের ছোট – ৰড় প্রতিটি কাজেই জীবকে প্রতিকূল ভাবের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেই এগিয়ে ’ যেতে হয় । এই শক্তি – সম্প্রয়োগের মাধ্যমেই জীবনের আলোক প্রবাহ ঝলমলিয়ে ’ এগিয়ে যায় । শক্তিসম্প্রয়োগ না থাকলে জড়তার অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ’ ফেলতে হয় । কিন্তু কোন ৰুদ্ধিমান মানুষই তা ’ পারে না , কারণ জিনিসটা তার গতিধর্মবিরোধী ।

এর ফলে হয় কী ! না , non – violence অর্থবাহী তথাকথিত অহিংস মতবাদকে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবার খাতিরে এই সকল অহিংসাবাদীদের প্রতি পদে কপটাচরণ বা হিপোক্রিসির আশ্রয় নিতে হয় । কোন দেশের লোক যদি অপর একটা দেশকে জবরদখল করে সেক্ষেত্রে বিজিত দেশের অধিবাসীরা শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা স্বাধীনতা পুনরর্জন করবে । এই শক্তি – সম্প্রয়োগ স্থূলও হতে পারে , সূক্ষ্মও হ’তে পারে , আর এর ফলে আক্রমণকারীর শরীর ও মন দুইই আহত হতে পারে । আঘাত এতে হৰেই , আর আঘাতই যখন হ’ল তখন তাকে কিছুতেই অহিংসা বলতে পারি না । হাতে না মেরে ’ ভাতে মারাটা কি হিংসা নয় ? দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন কি হিংসা নয় ? তাই ৰলি non – violence ও অহিংসাকে এক করে ’ দেখতে গেলে সেই অহিংস নীতির সমর্থনে বার বার কপটাচরণের পরিচয় দিতে হয় । দেশ শাসন করতে গেলে

পুলিশ বা সৈন্যৰলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে । তারা যদি প্রয়োজনৰোধে শক্তি – সম্প্রয়োগে বিরত হয় তাহলে তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে কি ? বুলেটে অহিংসার ছাপ মেরে ’ দিলেই তো আর বুলেট অহিংস হয়ে যায় না ।

অত্যাচারকারীকে প্রতিহত করবার জন্যে যতটা শক্তি – সম্প্রয়োগের প্রয়োজন ততটা শক্তি যার নেই তার উচিত সর্বতোভাবে শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হওয়া ও অর্জিত শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা । শক্তি নেই , শক্তিসঞ্চয়ের সাধনা নেই , অথচ নিজেদের এই সকল দুর্বলতা প্রতিপক্ষের কাছে স্বীকার না করার উদ্দেশ্যে নিজেকে অহিংস ৰলে ' জাহির করায় হয়তো কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হ’তে পারে , কিন্তু তাতে সাধুতার সম্মান রক্ষিত হয় না ।

সাধনা – জগতে অহিংসার যা ’ প্রকৃত অর্থ তা ’ আগেই বলেছি । এই অর্থ অনুযায়ী তোমাকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে ’ চলতে হৰে যে তোমার কাজ বা চিত্তার দ্বারা আর কেউ তো অত্যাচারিত বা পীড়িত হচ্ছে না । যেখানেই তোমার চিন্তা বা ক্রিয়া কাউকে পীড়ন করবার মতলবে সৃষ্ট বা পুষ্ট হচ্ছে তা – ই হিংসা পর্যায়ভুক্ত । জীবদেহ ধারণের জন্যে জীবহত্যা অনিবার্য্য , এখানে কোন পীড়নের মতলৰ থাক বা না থাক । তোমার শ্বাস – প্রশ্বাস ক্রিয়ায় হাজার হাজার জীবাণুর মৃত্যু হচ্ছে । তোমার স্থূল দেহ হাজার হাজার জীবকোষের (protoplasmic cells) সামবায়িক সৃষ্টি ।

তোমার শরীরের প্রতিটি কার্যের ফলে প্রতি মুহূর্তে তোমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তারা মরে ’ ঝরে ’ পড়ছে । শরীরকে রোগমুক্ত করবার জন্যে ঔষধ প্রয়োগ করে ’ তুমি লক্ষ লক্ষ রোগ – জীবাণুকে হত্যা করছ ; পোকা – মাকড়কে , শস্যনষ্টকারী পশুকে , ছারপোকা – মশা মাকড়সাকে কত ভাবে হত্যা করছ । এগুলোর প্রত্যেকটিই তোমার দেহাধরণ – যজ্ঞের অঙ্গমাত্র । এগুলোর কোনটাই পীড়নেচ্ছা – প্রণোদিত নয় । তাই এ কাজগুলো হিংসাও নয় । দেহ রক্ষা করতে হলে এ কাজগুলো তো করতেই হবে ।

জীবদেহের সৃষ্টি – স্থিতি – সংঘাতে প্রতি মুহূর্তে জীবদেহে সঞ্চয় ও অপচয় ঘটে ’ চলেছে । তুমি যে ভাত খাও সেই ভাতের সম্ভাবনা যে ধানের মধ্যে ছিল সেই ধানও কি জীব নয় ? তার মধ্যেও কি অঙ্কুর সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির সামর্থ্য ছিল না ? কিন্তু দেহরক্ষার খাতিরে তুমি সেই ধানকে হত্যা করে চাল তৈরী কর । কিন্তু এই চাল তৈরী করবার সময়ে তোমার মনের মধ্যে কি কাউকে পীড়ন করবার মতলৰ থাকে ? তা’হলে দেখলে প্রাণীর খাদ্য প্রাণীই । সেখানে হিংসা – অহিংসার প্রশ্নই উঠতে পারে ন । যদি ওঠে তাহলে জীবকে ইট , ৰালি , পাথর খেয়ে ’ থাকতে হয় . ... .. শ্বাস – প্রশ্বাস ক্রিয়া ছেড়ে ’ দিতে হয় অর্থাৎ , আত্মহত্যা করতে হয় ।

অবশ্য এ কথাটা খুৰই ঠিক যে খাদ্যগ্রহণকালে দু'টি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার । প্রথমটি হ'ল খাদ্য নির্বাচন যতদূর সম্ভব অবিকশিত চৈতন্য জীবের মধ্য থেকে (অর্থাৎ শাক – সব্জী পাওয়া গেলে পশুহত্যা না করে ') করা উচিত , আর দ্বিতীয় কথা হ'ল যে কোন অবস্থাতে কোন জীবকে (তা ' বিকশিতচৈতন্যই হউক আর অবিকশিতচৈতন্যই হোক) খাদ্যার্থে হত্যা করার আগে ভেবে ' দেখতে হৰে যে একে হত্যা না করেও আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারি কি না ।

মানুষের শরীর অজস্র জীবকোষের সমবায়ে তৈরী । এই জীবকোষগুলি অনুরূপ জীবিত সত্তার সাহায্যেই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়ে থাকে । তাই তুমি যেমনধারা খাদ্য গ্রহণ করবে তোমার শরীরস্থ জীবকোষসমূহ তদনুরূপ স্বভাব পেতে থাকৰে , আর শেষ পর্যন্ত তাদের মিলিত প্রভাব তোমার মনের ওপরও নিশ্চয়ই কিছুটা পড়ৰে । তাই গলিত দুর্গন্ধযুক্ত জৈব বস্তু থেকে অথবা হীনবৃত্তি – প্রৰল টাটকা পশুমাংস থেকে নিজের দেহকোষগুলি যদি তৈরী কর সেক্ষেত্রে তোমার মনে হীনবৃত্তির প্রাবল্য দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন না থাকলেও বিচার – বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে “ যা ” পাই তাই খাই ” নীতি কিছুতেই সমর্থন করা যায় না । “ যা ইচ্ছা যায় তাই করি ” নীতি তো তোমার নয় । তুমি বিচার খাটিয়ে নীতি নির্দ্ধারণ কর । তাই শরীর

– ধর্মের অনুশীলনে খাদ্য গ্রহণকালে তোমাকে একটা নীতি মেনে ’ চলতেই হৰে । অন্যথায় কাজটা অপরিগ্রহবিরোধী হয়ে দাঁড়াৰে । অপরিগ্রহ জিনিসটা কী তা ’ পরে ৰোঝাচ্ছি ।

হিংসা আর শক্তি – সম্প্রয়োগ দু’টো অবশ্যই এক জাতীয় নয় । তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে শক্তি – সম্প্রয়োগের পরিণাম হিংসাপূর্ণই হয়ে দাঁড়ায় যদিও সেই সম্প্রয়োগগুলো পীড়নের উদ্দেশ্যে করা হয় না । এই জাতীয় হিংসা পরিণামী । শক্তি সম্প্রয়োগ যাদের বিরুদ্ধে অবস্থার চাপে পড়ে ’ করতে হয় সংস্কৃত ভাষায় তাদের ‘ আততায়ী ' ৰলা হয় । “ ক্ষেত্রদারাপহারী চ শস্ত্রধারী ধনাপহাঃ । অগ্নিদগরদশ্চৈব ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ ।। ” ১০ অর্থাৎ যে জবরদস্তি করে ’ তোমার ভূ – সম্পত্তি দখল করতে চায় , যে তোমার পত্নীকে অপহরণ করতে চায় , যে অস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে হত্যা করতে এসেছে , যে তোমার ধনাপহারী , যে গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে এসেছে অথবা বিষ প্রয়োগ করে ’ তোমাকে হত্যা করতে চায়— এই ষড়বিধ দোষের যে কোন একটি দোষ থাকলেই তাকে আততায়ী ’ ৰলা হয় । তাহলে বুঝলে , যদি কোন ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেউ · অপর কোন রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে জৰৱদখল করে সেক্ষেত্রে সেই আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া মোটেই অহিংসানীতি – বিরুদ্ধ নয়

। বরং এরূপ ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির ভুল ব্যাখ্যা করলে অর্থাৎ হিংসা আর শক্তি – সম্প্রয়োগকে এক করে ’ ফেললে জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে ’ অর্থনাশ , মনস্তাপ ও অন্যান্য বহু প্রকার বিপর্যয়ে ভুগে ’ মরতে হয় । অনেক সময়ে দেখবে , কোন কুসংস্কারপন্থীকে যুক্তি দিয়ে না ৰুঝিয়েই অনেক লোক তার মনে আঘাত দিয়ে কথা ৰলে বা কাজ করে । যারা মূর্ত্তিপূজাবিরোধী , ইতিহাসের পুরোনো পাতা উল্টালে দেখৰে , অনেক সময় তারা কারুকার্যখচিত অপূর্ব শিল্পনিদর্শনমণ্ডিত সুন্দর সুন্দর মন্দির ধ্বংস করেছে । মানস সুষমার সুন্দর অভিব্যক্তি , কলাশিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দর সুন্দর মূর্তি ভেঙ্গেচুরে ’ নষ্ট করে ’ দিয়েছে । এই রকমের প্রত্যেকটি কাজই গুরুতর রকমের হিংসামূলক কাজ , কারণ এতে করে ’ হিংসা আর শক্তি – সম্প্রয়োগ দু’টো অবশ্যই এক জাতীয় নয় । তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে শক্তি – সম্প্রয়োগের পরিণাম হিংসাপূর্ণই হয়ে দাঁড়ায় যদিও সেই সম্প্রয়োগগুলো পীড়নের উদ্দেশ্যে করা হয় না । এই জাতীয় হিংসা পরিণামী শক্তি সম্প্রয়োগ যাদের বিরুদ্ধে অবস্থার চাপে পড়ে ’ করতে হয় সংস্কৃত ভাষায় তাদের ‘ আততায়ী ' ৰলা হয় ।

“ ক্ষেত্রদারাপহারী চ শস্ত্রধারী ধনাপহাঃ ।

অগ্নিদগরদশ্চৈব ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ ।। ”

অর্থাৎ যে জবরদস্তি করে ’ তোমার ভূ – সম্পত্তি দখল করতে চায় , যে তোমার পত্নীকে অপহরণ করতে চায় , যে অস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে হত্যা করতে এসেছে , যে তোমার ধনাপহারী , যে গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে এসেছে অথবা বিষ প্রয়োগ করে ’ তোমাকে হত্যা করতে চায়— এই ষড়বিধ দোষের যে কোন একটি দোষ থাকলেই তাকে আততায়ী ’ ৰলা হয় । তাহলে বুঝলে , যদি কোন ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেউ · অপর কোন রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে জৰৱদখল করে সেক্ষেত্রে সেই আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া মোটেই অহিংসানীতি – বিরুদ্ধ নয় । বরং এরূপ ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির ভুল ব্যাখ্যা করলে অর্থাৎ হিংসা আর শক্তি – সম্প্রয়োগকে এক করে ’ ফেললে জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে ’ অর্থনাশ , মনস্তাপ ও অন্যান্য বহু প্রকার বিপর্যয়ে ভুগে ’ মরতে হয় ।

অনেক সময়ে দেখবে , কোন কুসংস্কারপন্থীকে যুক্তি দিয়ে না ৰুঝিয়েই অনেক লোক তার মনে আঘাত দিয়ে কথা ৰলে বা কাজ করে । যারা মূর্ত্তিপূজাবিরোধী , ইতিহাসের পুরোনো পাতা উল্টালে দেখৰে , অনেক সময় তারা কারুকার্যখচিত অপূর্ব শিল্পনিদর্শনমণ্ডিত সুন্দর সুন্দর মন্দির ধ্বংস করেছে । মানস সুষমার সুন্দর অভিব্যক্তি , কলাশিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দর সুন্দর মূর্তি ভেঙ্গেচুরে ’ নষ্ট

করে ’ দিয়েছে । এই রকমের প্রত্যেকটি কাজই গুরুতর রকমের হিংসামূলক কাজ , কারণ এতে করে ’ মূর্ত্তিপূজকের মনে বড় রকম চোট লাগে , যার ফলে তারা মনে মনে মূর্ত্তিপূজা অর্থহীন জেনেও জেদের বশে মূর্তিকে আঁকড়ে ’ ধরে ’ থাকতে চায় । এর ফলে শুধু তাদেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয় না , সমগ্র মানব সমাজেরই অগ্রগতি ৰাধাপ্রাপ্ত হয় । মনে রেখো , কোন দেশ বিশেষের শতকরা এক শ ' জন লোকও যদি নিরাকারবাদী হয় অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক গোণা একজনও না থাকে সেক্ষেত্রেও বস্তুর উপযুক্ত ব্যবহারের খাতিরে ব্রহ্মচর্য – সাধক সেই মূর্ত্তিকে সযত্নে প্রত্নতত্ত্বাগারে (museum) রক্ষা করবে , কিছুতেই তা ’ বিনষ্ট করবে না । কলাকে (art) ধ্বংস করতে গেলে মানব মনের সুক্ষ্ম রসবোধটুকু ধ্বংস করে ’ দিতে হয় যা ’ কিছুতেই করা চলবে না ।

যার শিখা বা উপবীতের ওপর মোহ রয়েছে তার মন একটা জড় বস্তুতে আটকে ’ থাকায় সাধনায় অগ্রগতি অবশ্যই ৰাধাপ্রাপ্ত হৰে । কেউ যদি জোর করে ’ তার শিখা বা উপবীত সরিয়ে দিতে চায় তাতে কি বিশেষ কিছু লাভ হৰে ? – না , তাতে করে ' তার মন শিখা উপবীতের চিন্তায় এত ৰেশী ব্যস্ত থাকৰে যে তার ফলে ব্রহ্মসাধনাই ঠিকভাবে করবার সময় পাবে না । তার চাইতে বরং ব্রহ্মভাবনা নিতে নিতে মন যখন বৃহতের ভাবনায় ব্যস্ত হ’তে

থাকবে তখন আপনা থেকেই শিখা – সূত্রের সঙ্কীর্ণতা মন থেকে সরে ’ যাবে আর সেই অবস্থাতেই তার পক্ষে শিখা – সূত্র সত্যিকারের ত্যাগ করা সম্ভব হবে ।

যম – সাধনার ‘ অহিংসা ’ অঙ্গটা এবার নিশ্চয়ই ভাল করে ’ বুঝেছ । এখন বলো দেখি , পিতা – মাতা যে পুত্রকে শাসন করেন সেটা হিংসা , না অহিংসা ? না , সেটা হিংসা নয় কারণ সেখানে পীড়ন করা বা কষ্ট দেওয়ার ভাব একেবারেই নেই । যোল আনা ভাবটাই হচ্ছে সংশোধন করার— কাঁদিয়ে কষ্ট দেবার নয় । চোর – ডাকাত , সাধু – মিত্র যেই হোক না কেন , সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যার বিরুদ্ধে যে সংশোধনী ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে সেটা আপাতঃদৃষ্টিতে যতই কঠোর হোক না কেন , তা ’ হিংসা পদবাচ্য নয় । এবার বুঝলে , সত্যিকারের অহিংসা বাস্তব জীবনে মেনে ’ চলা মোটেই কষ্টকর নয় ।

খাদ্য হিসেবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে , বিশেষ করে ’ যে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শাক – সব্জী পাওয়া যায় সে দেশে আমিষ খাদ্য গ্রহণ করা অতিলোভের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয় । তবে শারীরিক প্রয়োজনে চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশে , রোগ মুক্তির পর পথ্য হিসেবে বা ঔষধ নির্মাণের উপকরণ হিসেবে আমিষের ব্যবহার হিংসা বা লোভ বলে ’ গণ্য হতে পারে না , কারণ সেক্ষেত্রে হিংসা – বৃত্তি বা লোভ – বৃত্তি কোনটাই কাজ করে না , কাজটা করা হয় নেহাৎই

বেঁচে থাকবার তাগিদে , হিমপ্রধান দেশের মানুষ যে তাগিদে পশুমাংস ভক্ষণ করে , পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন করে ও পশুমেদে প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে ।

আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাতেই পৌরুষের পরিচয় মেলে । রামায়ণ মহাকাব্যের দিকে তাকাও , সেখানে রাম পত্নীহরণকারী রাবণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিলেন , প্রবলভাবে শক্তি সম্প্রয়োগ করেছিলেন । এতে করে ’ তাঁর কাজ কিছুতেই অহিংসানীতির বিরোধী হয় নি , কারণ তিনি তো পীড়নের উদ্দেশ্যে বা দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন নি ।

মহাভারতের দিকে তাকাও । সেখানে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে কৌরবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছিলেন কারণ কৌরবেরা ছিলেন ভূমি অপহরণকারী আততায়ী ।

ধর্ম তথা সমাজ জগতের অন্যতম বিপ্লবী নেতা প্রেমাবতার শ্রীমৎ মহাপ্রভুকে কেউই নিশ্চয়ই হিংসানীতি গ্রহণের অপবাদ দিতে সাহস করবে না । কিন্তু তিনিও অত্যাচারী কাজীর ওপর সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে ’ পড়েছিলেন । হিংসা ও শক্তি – সম্প্রয়োগ যদি একই জিনিস হ’ত তবে ক্ষমাঘনমূর্ত্তি মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তা ’ করতেন না ।

আততায়ীর বিরুদ্ধে শক্তি – সম্প্রয়োগ করাতেই পৌরুষ , না করাই ক্লীবতা । তবে দুর্বল ব্যষ্টি নিজে সৱল আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবার আগে নিজের সম্ভাব্য শক্তিটাও যেন যাচাই করে ’ নেয় , অন্যথায় নিজের দুর্বলতা দূর না করে ’ সংগ্রাম শুরু করলে অন্যায়েরই সাময়িক জয় হয়ে ’ থাকে । ইতিহাসে এ জাতীয় ভুলকে “ রাজপুত নির্বুদ্ধিতা ” (Rajput folly) ৰলা হয় । শক্তিশালী মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুতেরা সবসময়েই সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে এগিয়ে ’ এসেছে । তারা বীরোচিত ভাবে নিজেরা সংগ্রামে লড়ত বটে , কিন্তু নিজেদের শক্তি যাচাই করে ’ নিয়ে লড়াইয়ে নাৰত না । তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল অজস্র রকমের ভেদ , নানান্ রকমের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা । তাই লড়াইয়ে তারা হেরে ’ যেত , বীরের মত মৃত্যুবরণ করত ।

আততায়ীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগে তাই উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় করা উচিত , কিন্তু আততায়ীর স্বভাব সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে : ক্ষমা করার অর্থ জেনেশুণে ’ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া । অবশ্য যেখানে দেখৱে তুমি শক্তি – সম্প্রয়োগ কর বা না কর , আততায়ী তোমাকে ধ্বংস করৱেই , সেক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে সময়ের অপেক্ষা না করে ’ অন্ততঃ একটাও মরণ কামড় দিয়ে তারপরে মরাই বাঞ্ছনীয় ।

সূচীপত্র

3 সত্য

“ পরহিতার্থং বাঙ্মনসো যথার্থত্বং সত্যম্ ”

অর্থাৎ পরহিতের উদ্দেশ্যে বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব তারই নাম ‘ সত্য ' । মনে রাখবে , ‘ সত্য ’ শব্দের কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই । ইংরেজীতে যাকে true ব truth ৰলে তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হ’ল ‘ ঋত ’ । সাধককে ঋতের অনুশীলন করতে বলা হচ্ছে না— বলা হচ্ছে সত্যের অনুসরণ করতে । সত্যের বৈবহারিক অংশ হ’ল আপেক্ষিকতা – ভিত্তিক কিন্তু এর সম্যক্ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিক তত্ত্বে ... ... সেই পরম ব্রহ্মে । তাই ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ বলা হয় । “ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ” । সাধকের লক্ষ্য যদিও সেই পারমার্থিক তত্ত্ব তবুও সাধক – জীবনে তাকে অহরহই আপেক্ষিকতা নিয়ে কারবার করতে হয় । মানুষ বিচারশীল জীব । তাই যেখানে যেমনটি করা উচিত বা যেমনটি করলে মানুষের কল্যাণ হয় তেমন কিছু করবার সামর্থ্য কম আর বেশী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে । তেমন কিছু করা , বলা বা ভাবাকেই সাধনাজগতে ‘ সত্য ’ ৰলা হয় । মনে কর , একজন মানুষ ভয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে তোমার কাছে

এল । সে দোষী কি নিদোষ তুমি জান না অথবা তুমি জান সে নির্দোষ । তার পেছনে আসছে এক শক্তিশালী দুর্দ্দান্ত মানুষ তাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে । এখন এই ভীত লোকটি যদি তোমার বাড়ীতে লুকোয় আর দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকটি এসে ’ যদি তোমাকে শুধোয় , “ অমুক লোকটি কোথায় গেছে দেখেছ ? ” তুমি কী বলবে ? যদি ঋত বা truth- কে মানতে হয় সেক্ষেত্রে তুমি বলৰে— দেখ , অমুক জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে । এর পরে সেই দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকটি যদি তাকে হত্যা করে তাহলে তুমিও কি সেই হত্যাকাণ্ডের অংশভাগী হ’লে না ? তোমার ভুলের ফলেই হয়তো একজন নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাল ! ঋত বা truth- কে মানতে গিয়ে তুমি হত্যাপরাধে পরোক্ষভাবে অপরাধী হয়ে রইলে । কিন্তু শাস্ত্রীয় অর্থে ‘ সত্য ’ শব্দকে মানতে গেলে এ জায়গায় তোমার কী কর্ত্তব্য হবে ? তোমার কর্তব্য হবে , লোকটির সন্ধান না দেওয়া আর তার হিতার্থে আক্রমণকারী ব্যষ্টিকে এমন একটা উল্টো পথ দেখিয়ে দেওয়া যার ফলে আশ্রিত ব্যষ্টিটি নির্ভয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে ’ যেতে পারে ।

ধরো , তোমার মা খেতে বসেছেন । চিঠি এল , তোমার মাতামহের মৃত্যু হয়েছে । চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তোমার মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন সে অবস্থায় তুমি কী ৰলৰে ? ঋতকে যদি মানতে হয় তাহলে মা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড পিতৃশোক তো পাৰেনই , অধিকন্তু তাঁর আহারও নষ্ট

হবে । এক্ষেত্রে তোমার উচিত হবে বলা যে মাতুলালয়ে সবাই সুস্থ আছেন । মায়ের আহারের পর প্রথমে মাতামহের অসুস্থতার কথা শুণিয়ে তাঁর মনকে সম্ভাব্য শোকবার্তা সম্বন্ধে কতকটা সচেতন করে ’ দিয়ে তারপরে মাতামহের মৃত্যুসংবাদ জানাবে । এতে গোড়ার দিকে অনেকগুলো অনৃতের আশ্রয় নিতে হ’ল বটে কিন্তু এর ফলে সত্যেরই অনুশীলন করা হ'ল ।

সূচীপত্র

4 অস্তেয়

“ পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঁহস্তেয়ং ”

অর্থাৎ অন্যের দ্রব্য দখল না করার নামই অস্তেয় অর্থাৎ ‘ অস্তেয় ' শব্দের অর্থ অচৌর্য । এই চৌর্য জিনিসটা আবার চার রকমের ।

১) স্থূলভাবে কারও জিনিস চুরি করা । সাধারণতঃ এই স্থূল চোরকেই আমরা লৌকিক ভাষায় চোর বলে থাকি । টাকা - পয়সা বা জিনিস - পত্তর লুকিয়ে নিয়ে পালালে বা অস্ত্র - শস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করে লুঠে ’ নিয়ে ‘ পালালেই যে কেবল চোর হ’ল তা ’ নয় । গায়ের জোরে , অস্ত্রের জোরে বা বুদ্ধির জোরে অন্যের টাকা - পয়সা বা গৃহসম্পত্তি যা ’

কিছুই দখল কর না কেন , সে সমস্তই চৌর্য পর্যায়ভুক্ত কারণ তাতে অন্যের জিনিস ঠকিয়ে দখল করবার বৃত্তি থেকে ’ যাচ্ছে । ন্যায়সঙ্গতভাবে কারও সঙ্গে কোন বস্তুর বিনিময় করে ' (যেমন টাকার সঙ্গে জমির , টাকার সঙ্গে চাল – ডাল , সোণা – রূপার) কোন কিছু গ্রহণ করা চৌর্য পর্যায়ভুক্ত নয় ।

২) চৌর্যের দ্বিতীয় প্রকারভেদ হ’ল এই যে তুমি হয়তো স্থূলভাবে কারো কোন জিনিস দখল করলে না , বা বিষয় সম্পত্তিগত কোন ব্যাপারে কারও কোন জিনিস জবরদখল করলে না কিন্তু মনে মনে সেই রকম কোন কিছু করবার চিন্তা করে ' যাচ্ছ । এ জিনিসটাও চৌর্য পর্যায়ভুক্ত কারণ এক্ষেত্রে পুলিশের ভয়ে বা লোকাপবাদের ভয়ে তুমি হয়তো নিজেকে স্থূলভাবে চোরেদের দলে ফেললে না কিন্তু তোমার ভেতরের মানুষটি তো চুরি করল ।

৩) তুমি হয়তো কারো কাছ থেকে কোন জিনিসই দখল করছ না , কিন্তু অন্যকে তার প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করে ' তার ক্ষতির কারণ হচ্ছ । এ জিনিসটাও চৌর্য পর্যায়ভুক্ত ।

৪) উপযুক্তভাবে কাউকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না করে ’ যদি মনে মনে তাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা কর তাকেও চৌর্য ৰলা হৰে ।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের চৌর্য জিনিসটা একটু ৰোঝাই । তোমরা হয়তো দেখে থাকৰে , অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকও বিনা টিকিটে ট্রেণে ভ্রমণ করে ’ থাকেন । এতে তাঁরা রেল – কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সোজাসুজি টাকা চুরি করছেন না বটে , কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষকে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করছেন । কিন্তু তলিয়ে ভেবে দেখতে গেলে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরোহীর সম্পর্ক ঠিক বিনিময় ব্যবসায়েরই মত আর তাই বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের চৌর্যের ই অংশভুক্ত । গাড়ীতে সে রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে সেবা নিল , টিকিটের মূল্য দিয়ে সে সেই সেবারই মূল্য কড়ায় – গণ্ডায় চুকিয়ে ’ দিলে । আর এর ফলে রেল কর্তৃপক্ষ কোন কালেই বলতে পারবে না যে আমি অমুক লোককে সেবা করেছি , কারণ সেবার বিনিময়ে অর্থ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেবার মাহাত্ম্যও নিঃশেষ হয়ে গেছে । কর্তৃপক্ষ যখন বিনামূল্যে সেবা বিতরণের জন্যে লাইন পাতেননি তখন তাঁদের টিকিটের মূল্য না দেওয়ার অর্থ চুরি করা ।

ভেবে দেখ দিকিনি , সামান্য বিশ – পঁচিশটা টাকার জন্যে যারা এ জাতীয় চুরি করে তারা কেমনধারা ভদ্রলোক ! অথচ এই শ্রেণীর লোকেই মুখে ৰড় বড় কথার খই ফুটিয়ে ’ চলে— কারণে – অকারণে নেতৃস্থানীয় ব্যষ্টিদের সমালোচনা করে , কে কত ৰড় চোর , কে কত ৰড় ঘুষখোর , কে কত ৰড় স্বজনপোষক প্রভৃতি । অথচ যখন তাদের দোষটুকু

দেখিয়ে দাও তারা হয়তো বলৰে– আরে মশায় , অতখানি নীতিবাদী হতে গেলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মুশকিল ! যে কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করেছে তাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহারই ঠিক অর্থাৎ চুরি করাই ঠিক । বিনা টিকিটে ধর্মপ্রচারক বা সন্ন্যাসী চলেছেন মুক্তির বাণী নিয়ে আর রাজনৈতিক নেতা চলেছেন দেশ উদ্ধারের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে — এ ছবি তোমরা অহরহঃ দেখৰে । আয়কর বা বিভিন্ন প্রকারের কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দেওয় । বা যানবাহনের নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে ’ কর্তৃপক্ষের নিকট ত’তে উষ্চতর শ্রেণীর রাহা - খরচ আদায় করা— এগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং এগুলো চুরি তো বটেই , অধিকন্তু ছ্যাচড়ামি ।

চৌর্য বৃত্তিগুলির প্রতিটিই অস্তেয় - নীতির বিরোধী । ৰুদ্ধিমান বিবেচক মানুষও অনেক সময় জেনেশুণে ’ অস্তেয়বিরোধী কাজ করে ’ ফেলে অথবা ছোটখাট চুরিকে অস্তেয়বিরোধী বলে ’ ভাবতেই চায় না । লেখকের বিশেষ পরিচিত জনৈক যানবাহন - কর্মচারী লেখককে তাঁর তের বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয়ের জন্যে পুরো টিকিট ব্যবহার করতে দেখে ৰলেছিলেন— “ আপনি অনায়াসেই এর জন্যে অর্দ্ধমূল্যের টিকিট ব্যবহার করতে পারতেন ।

কিছু কিছু এমন নীতিবাদীও আছে যারা ব্যষ্টিবিশেষকে কিছুতেই ঠকায় না , কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে বা গবর্নমেন্টকে ঠকানো অপরাধ ৰলে ’ মনে করে না । অনেক ব্যবসায়ীও এমন আছে যারা ক্রেতাকে ভেজাল ঘি ৰেচে , কিন্তু বাড়ীর অতিথি - অভ্যাগতদের খাঁটি ঘিয়ের লুচি খাওয়ায় । সকলেরই একথা মনে রাখা দরকার যে এই রকমধারা মনোভাবের প্রতিটি আচরণই অস্তেয়বিরোধী । যম - নিয়মের অন্যান্য প্রতিটি অঙ্গের মত অস্তেয়তেও প্রতিষ্ঠিত হবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে স্বগত অভিভাবন (auto - suggestion) । শিশুকাল থেকেই মানুষ যদি এই নীতিগুলো মনে মনে জপতে থাকে অর্থাৎ মনকে ৰোঝাতে থাকে তা হলে দেখা যাৰে যে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও , প্রলোভনের ভীড়ের মধ্যে থেকেও সে নিজের চিন্তা তথা চরিত্রের উন্নত মান ঠিকই ৰজায় রাখতে পারছে ।

সূচীপত্র

5 ব্রহ্মচর্য

‘ ব্রহ্মচর্য ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মে রত থাকা ।

“ ব্রহ্মণি বিচরণং ব্রহ্মচর্যম্ ”

মানুষ বহির্মুখী ভাব নিয়ে যখনই কোন কাজ করে বা কাজের ভাবনা নেয় তখনই সে যে বস্তুর সঙ্গে নিজেকে

সম্বন্ধিত করে ' কাজ করে বা কাজের ভাবনা নেয় সেটাকে জড় খণ্ডবস্তু হিসেবেই দেখে । আর ক্রমাগত সেই খণ্ডবস্তুর সাধনা করার ফলে মন এত বেশী বস্তুলিপ্ত হয়ে পড়ে যে তার চৈতন্যসত্তাও ক্রমশঃ জড়ত্বে পর্যবসিত হয়ে যায় । ব্রহ্মচর্য সাধনের তাৎপর্য হ'ল প্রতিটি বস্তু যাকে নিয়ে কাজ করছি বা চিন্তা করছি তাকে জড়বস্তু হিসেবে না দেখে ' ব্রহ্মেরই বিশেষ বিকাশ হিসেবে দেখা । এতে করে ' মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেলেও সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম ভাবনা থাকায় ব্রহ্ম থেকে সরে ' আর কোথাও যাচ্ছে না । এর ফলে প্রেয়সাধনা শ্রেয়সাধনাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় , কাম প্রেমে পর্যবসিত হয় ।

অনেকেই শুক্রধারণকেই ব্রহ্মচর্য বলে ' মনে করে ' থাকেন । তাঁদের মনে রাখা উচিত ' ব্রহ্ম ' ও ' চর্য ' এই দু'টি শব্দের কোনটিরই সঙ্গে ' শুক্র ' শব্দের কোন ভাবগত বা অর্থগত সঙ্গতি নেই । তাছাড়া দেহবৈজ্ঞানিক মতে একথা সম্পূর্ণ একটা বুজরুকি মাত্র । শরীরের কোন গ্রন্থিতে কোন ব্যাধি থাকলে বা ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বা অন্য কোন কারণে শরীর বিকলাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় ব্রহ্মচর্য সম্ভব নয় । অবশ্য একথা খুবই ঠিক যে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ নিয়ে চলতে গেলে অর্থাৎ সব কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন করতে গেলে মানুষের জীবনে সংযমের প্রয়োজন

অত্যন্ত অধিক কিন্তু সংযমের অর্থ প্রাকৃত ধর্মের বিরোধিতা নয় ।

সংযমের অর্থ প্রাকৃত ধর্মেরই যথাযথ অনুশীলন । বিশেষ কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুক্রক্ষয় সম্পূর্ণ রোধ করলে অথবা উপবাসের দ্বারা শুক্রের উদ্বৃত্ততা রোধ করার নীতিকে সাধারণতঃ লৌকিক ব্রহ্মচর্য আখ্যা দেওয়া হয় । অবিবাহিতের পক্ষে এ লৌকিক ব্রহ্মচর্যের (প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু ব্রহ্মচর্য নয়) কিছুটা মূল্য আছে , কারণ যে কামবৃত্তির দরুণ জাগ্রৎ , স্বপ্ন বা সুষুপ্তিকালে শুক্রক্ষয় হয়ে থাকে এতে করে ' সেই কামবৃত্তির স্ফুরণের কোন সম্ভাবনা থাকছে না , কারণ শুক্রের উদ্বৃত্তি না হওয়ায় তা ' ক্ষয়ের জন্যে কোন দেহগত প্রেরণা এরূপ ক্ষেত্রে থাকে না । কিন্তু খুব তলিয়ে ভাবতে গেলে এ লৌকিক ব্রহ্মচর্যের মূল্য কতটুকু ? শুক্রের উদ্বৃত্তি না হওয়া বা উদ্বৃত্ত শুক্রের ক্ষয় হওয়া দু'টোই কি এক জিনিস নয় ? এইমাত্র ৰলা যেতে পারে যে প্রথমোক্তটি অবিবাহিতের পক্ষে ভাল , দ্বিতীয়োক্তটি বিবাহিতের পক্ষে ২০ ভাল ।

যে সকল ব্যষ্টি বিভিন্ন প্রকারের জবরদস্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করে ' শুক্রক্ষয় রোধ করতে চায় তাদের শরীর ও মনের ওপর একটা বিশ্রী রকমের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় । শরীর অত্যন্ত শুকনো কঠোর লাবণ্যহীন হয়ে পড়ে ও জোর

করে ’ কামরিপুকে দমন করতে গিয়ে বাকী রিপুগুলো , বিশেষ করে ’ ক্রোধরিপু উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে ।

প্রাচীন কালে ‘ ব্রহ্মচর্য ’ শব্দের প্রকৃত অর্থই নেওয়া হ’ত । কিন্তু পরবর্তী কালে বিপ্রপ্রধান সমাজের যে বুদ্ধিজীবী অংশ সম্পূর্ণভাবে শোষকের রূপ পরিগ্রহ করেছিল তারা ভেবে ’ দেখলে যে ধর্মসাধনা জিনিসটা যদি সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের হাতে— গৃহস্থের হাতে ছেড়ে ’ দিই তাহলে আমাদের এত সাধের শোষণ যন্ত্র যে কোন মুহূর্তে বিকল হয়ে যেতে পারে । ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হলে জনসাধারণের মধ্যে বিচারশক্তি প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকবে । তাই এই জনসাধারণকে চিরদিনের জন্যে কাবু তথা পঙ্গু করে ’ রাখতে হবে । মানুষকে শোষণ করতে গেলে তাদের মনে ভীতম্মন্যতার তথা হীনম্মন্যতার ভাব প্রথমেই জাগিয়ে দিতে হবে । তারা দেখলে , শোষিত জনসাধারণ প্রায় সকলেই গৃহী— তাদের অধিকাংশই বিবাহিত । তাই কোনক্রমে যদি শুক্রক্ষয়কে ধর্মবিরোধী বলে প্রচার করে ’ দেওয়া যায় তাহলে অতি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে । ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতে । গৃহীরা ভাবতে আরম্ভ করলে , তারা শুক্রক্ষয় করে ’ মহা অন্যায় কাজ করে ’ থাকে— বড় রকমের পাপ করে ’ ব্রহ্মচর্য - বিরোধী অনুষ্ঠানে লিপ্ত হয় । আর সন্ন্যাসীরা শুক্রধারণ করে , সুতরাং তারা অনেক শ্রেষ্ঠ —

এই সুযোগে তথাকথিত সন্ন্যাসীরা অবাধে তাদের শোষণলীলা চালিয়ে এসেছে ও আজও তা ’ চালাচ্ছে ।

এই সন্ন্যাসীরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (যারা একেবারেই শুক্রক্ষয় করে না) কি না তার মীমাংসা তর্কের দ্বারা হয় না , এর মীমাংসা হয় ডাক্তারী পরীক্ষায় । তবে একথা নিঃসংশয়ে ৰলা যেতে পারে যে তথাকথিত সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না ।

স্নান , আহার , নিদ্রা , তন্দ্রাদির ন্যায় বিবাহও একটি প্রাকৃতিক জিনিস । সুতরাং এতে দূষণীয় বা ধর্মবিরোধী কোন কিছুই নেই । কোন মহৎ পুরুষ বা উন্নত সাধকের পক্ষে স্নানাহার যখন নিষিদ্ধ নয় তখন বিবাহও কোন যুক্তিতে নিষিদ্ধ হতে পারে না । তবে হ্যা , আহারে , নিদ্রায় বা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংযমের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী । যে অবস্থায় সংযম নেই তার পরিণামের নামই ব্যাধি । আহার করা ভাল কিন্তু আহারে সংযম না থাকলে উদরাময় দেখা দেয় । স্নান করা ভাল , কিন্তু স্নানে সংযম না থাকলে অর্থাৎ অতিরিক্ত স্নান করলে সর্দি রোগে আক্রান্ত হতে হবে । ঠিক তেমনি বিবাহ , কিন্তু বিবাহিত জীবনে অসংযম থাকলে নানা রকম ব্যাধি শরীরে মনে ফুটে ’ ওঠে ।

আহার – নিদ্রাদি প্রাকৃতিক কার্যগুলি থেকে বিবাহের একটু তফাও রয়েছে , কারণ বিবাহ জিনিসটা আহার – নিদ্রাদির মত অস্তিত্ব রক্ষার

যারা শৈব , শাক্ত , বৈষ্ণব অথবা যারা পুরাণ মানে তাদের পক্ষে এই তথাকথিত ব্রহ্মচর্যকে সমর্থন করবার কোন যুক্তিই দেখতে পাচ্ছিনা কারণ তাদের দেবতা শিব , বিষ্ণু , কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই সোজা ভাষায় গৃহী বলতে যা ' বোঝায় তা – ই । পুরাণে এঁদের পত্নীদের তথা সন্তান সন্ততির নামও উল্লিখিত হয়েছে ।

ধর্ম জিনিসটা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত । " ধর্ম সঃ ন যত্র ন সত্যমস্তি । " যেখানে সত্য নেই সেখানে ধর্ম নেই । ব্রহ্মচর্যের এই উদ্ভট ব্যাখ্যায় আর যা ' কিছুই থাক না কেন , সত্য নেই । তাই তাতে ব্রহ্মও নেই । যা ' সহজ সত্য তাকে স্বীকার করেই মানুষকে পরম শ্রেয়ের পানে এগিয়ে যেতে হবে । সেটাই সাধকের পথ । সেটাই ধর্মের পথ । বাস্তব জীবনে যা ' সহজ ও সরল সত্য তাকে অস্বীকার করায় পরপিণ্ডভোজী ধর্মব্যবসায়ীর হয়তো কিছুটা সুবিধা হতে পারে , কিন্তু তাতে ধর্মের মর্যাদা রক্ষিত হয় না । সে পথ সত্যের পথ নয় , কপটাচরণের পথ ।

সূচীপত্র

6 অপরিগ্রহ

ভোগক্রিয়ায় বিষয়ীগত সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য আর বিষয়গত সংযমের নাম অপরিগ্রহ ।

“দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারো২ পরিগ্রহঃ”

দেহরক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন ভোগ্য বস্তুর আরাধনায় নিরত না থাকার নামই অপরিগ্রহ ।

দেহ রাখতে গেলে অন্ন চাই , বস্ত্র চাই , বাসগৃহও চাই । বার্দ্ধক্যের সংস্থান তথা লৌকিক নির্ভরশীলদের জন্যে অর্থ বা শস্যক্ষেত্রও চাই । সুতরাং দেহরক্ষার জন্যে প্রয়োজন কার কতখানি তা ’ নির্দ্ধারণ করতে গেলে অনেকগুলি বিষয়ই ভেবে ’ দেখা দরকার । কোন দু’টো মানুষের প্রয়োজন হয়তো ঠিক এক রকমের নয় । এ প্রসঙ্গে তাই কার কতখানি সর্বনিম্ন প্রয়োজন তা ’ নির্দ্ধারণ করা একটি দুরুহ ব্যাপার , কারণ জিনিসটা সম্পূর্ণভাবেই একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব । সর্বনিম্ন প্রয়োজন সমাজের পক্ষ থেকে কিছুটা নির্দ্ধারণ করে ’ দেওয়া যেতে পারে । যেমন , কেউ এত টাকার বেশী জমাতে পারবে না বা কেউ এতগুলোর বেশী ৰাড়ী রাখতে পারবে না , বা কারো এত পরিমাণের অধিক ভূ – সম্পত্তির মালিকানা থাকৰে না ইত্যাদি ।

কিন্তু এই সর্বনিম্ন মানটুকু সমাজের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে নির্দ্ধারণ করে ’ দেওয়া সম্ভব নয় । ভূ – সম্পত্তির পরিমাণ নিদ্ধারণ করে দেওয়া গেলেও খাদ্যের পরিমাণ বেঁধে ' বা মেপে দেওয়া সম্ভব নয় । ঔদরিক প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য গ্রহণ করে ’ রোগগ্রস্ত হতে পারে , বিলাসী প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসদ্রব্য ক্রয় করে নিজেকে ঋণগ্রস্ত করে ’ ফেলতে পারে । তাই ব্যষ্টিগত জীবনে অপরিগ্রহের প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও ব্যষ্টি যদি সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে তাতেই বেশী সুবিধা । ব্যষ্টিগত প্রয়োজনের যে অংশটাকে ব্যষ্টিগত বিচারের ওপর ছেড়ে ’ দিতে হচ্ছে সেটাও ব্যষ্টিবিশেষের সুখবোধ বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে ।

দেশ ও পাত্রভেদেও তা ’ পরিবর্তিত হয় । দৃষ্টান্ততঃ ৰলতে পারি , একজন মানুষ যে ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য করে ’ যেতে পারে অন্য একজন মানুষকে সে অবস্থায় ফেললে হয়তো তার মৃত্যু হবে । সুতরাং সে পরিস্থিতিতে প্রথমোক্ত ব্যষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়োক্ত ব্যষ্টির ক্লেশ দূর করবার জন্যে বিশেষ ভোগ্য বস্তুর প্রয়োজন থেকে ’ যাচ্ছে যা ’ তার পক্ষে অপরিগ্রহ – বিরোধী নয় । এ ব্যাপারে দেশগত ভেদও বিশেষভাবে বিচার্য । বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে পশমী পোষাকের প্রয়োজন থাকে না কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সাইবেরিয়াতে তার প্রয়োজন রয়েছে । এ ব্যাপারে কালগত ভেদের কথাও ভেবে ’ দেখার দরকার আছে । প্রাগৈতিহাসিক

যুগের একজন সাধারণ মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন যে স্তরে সীমাব্দ্ধ ছিল আজকের দিনের একজন সাদাসিধে মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন সে স্তরে সীমিত নয় । তার কারণ আজকের পৃথিবীতে সেকালের তুলনায় ভোগ্যবস্তু অনেক সহজলভ্য হয়েছে , ভবিষ্যতে আরও হবে । সুতরাং অপরিগ্রহ সাধনাকালে এই কালগত ভেদের কথা ভুলে ’ গেলে বস্তুতান্ত্রিক জগৎ থেকে সরে যেতে হবে , একটা খাপছাড়া সমাজছাড়া মানুষ হয়ে যেতে হবে । চীনীর যুগে গুড়ের মাহাত্ম্য প্রচার করে ’ বা রেলগাড়ীর যুগে গো - যানের মাহাত্ম্য প্রচার করে ’ অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা অর্থহীন । আজকের পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষ বস্তুতান্ত্রিক জগতে যার সময়ের মূল্য আর পাঁচজনের চাইতে বিশেষ বেশী নয় তার পক্ষে এরোপ্লেনে চড়া অবশ্যই অপরিগ্রহ - বিরোধী , কিন্তু ট্রেণে চড়া মোটেই অপরিগ্রহ - বিরোধী নয় ।

তাই ৰলছিলুম ব্যষ্টিবিশেষকে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মান নির্দ্ধারণ করে ’ দিয়ে সমাজ অনেকটা সাহায্য করতে পারে বটে , কিন্তু অপরিগ্রহে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে ব্যষ্টিগত প্রয়াসের ওপরেই নির্ভরশীল । নিজেকে ও পরিবারবর্গকে শারীরিক , মানসিক ও আত্মিক জীবনে সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে ’ সর্বসাধারণের মুখ চেয়ে নিজের ভোগোপাদান কমিয়ে ফেলার সীমাহীন

সংগ্রামের নামই অপরিগ্রহ । অপরিগ্রহে ভোগ্যবস্তুর পরিমাপ দেশ – কাল – পাত্রভেদে কমৰে বা ৰাড়ৰে , কিন্তু ‘ অপরিগ্রহ ' শব্দটির উপযুক্ত ব্যাখ্যা সর্বদেশে সর্বকালে সকল পাত্রের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য ।

সূচীপত্র

7 সমাজে কী ভাবে থাকতে হৰে

আদর্শ সমাজ – ব্যবস্থা নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামবায়িক আচরণের ওপর , আর এই সামবায়িক আচরণ আবার যম – নিয়মের সাধনার ওপর নির্ভরশীল । তাই আধ্যাত্মিক সাধনা , বিশেষ করে ’ যম – নিয়মের সাধনাই আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি ।

দেখা যায় , ৰহু লোক যম – নিয়মবিরুদ্ধ অমিতব্যয়িতার ফলে ঋণগ্রস্ত হয়ে সমাজের কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার , মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যষ্টিমাত্রকেই রক্ষা করা যেমন সমাজের কর্ত্তব্য , ব্যষ্টির আচরণ , যম – নিয়ম বিধি পালন তথা ব্যয় – সংযমের ওপর সমাজের অধিকার থাকাও তেমনি অবশ্য প্রয়োজন । কারও পরামর্শ না নিয়ে ব্যয় করে ’ ঋণগ্রস্ত হয়ে

সকলের সাহায্য চাওয়া সঙ্গত নয় , আর এ ধরণের মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়াও চলে না ।

ধার করে’ টুইডে কাজ চললেও সার্জ কেনা বা সার্জে কাজ চললেও গ্যাৰার্ডিন কেনা নিশ্চয়ই অপরিগ্রহবিরোধী কাজ । অনুরূপভাবে প্রত্যেকেরই এমন আহার্য গ্রহণ করা উচিত যা’ পুষ্টিকর অথচ ব্যয়সাপেক্ষ বা ঘি–তেল–মশলাৰহুল নয় । ঋণ করে’ অন্যকে খাওয়ানোর অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করা দরকার । এই জন্যেই প্রত্যেকের আচরণ তথা ব্যয়–সংযমের অধিকার সমাজের হাতে থাকা অপরিহার্য। এজন্যেই · প্রত্যেক আনন্দমার্গীর কর্তব্য যম–নিয়মবিরোধী কর্মে রত মার্গী ভ্রাতাকে মধুর বা কর্কশ ভাষায় বা আরও কঠোরভাবে তার অভ্যাস সংশোধন করে’ সমাজকে দৃঢ় করা।

প্রত্যেক আনন্দমার্গীর প্রতি আমার নির্দেশ , আজ থেকে তারা যেন অপর মার্গী ভাইদের যম–নিয়ম পালনে বাধ্য করে আর নিজেও এ ব্যাপারে নিঃসঙ্কোচে অন্য মার্গী ভাইয়ের নির্দেশমত চলতে অন্যথা না করে ।

অপরিগ্রহ সম্বন্ধে আমার আরও একটি উপদেশ , কোন মার্গীর তার বাঁধা খরচের অতিরিক্ত (অতিরিক্ত খরচের নমুনা হ’ল মূল্যবান পোষাক – পরিচ্ছদ , অলঙ্কার , আসৰাৰপত্র ক্রয় , বিবাহ , গৃহনির্মাণ ইত্যাদিতে) কিছু ব্যয়ের প্রয়োজন ৰোধ হ’লে তৎপূর্বে তার আচার্য , ইউনিট

সেক্রেটারী , ভুক্তিপ্রধান বা অন্য দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত ব্যষ্টির স্পষ্ট আদেশ নেৰে । তেমনি ব্যবসাদার বা মহাজনের কাছে ধার নেওয়ার আগেও আদেশ নেওয়া প্রয়োজন । কারও নিজ আচার্য অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যষ্টির সঙ্গে যোগাযোগের অভাব হ' লে অন্য আচার্য , তাত্ত্বিক অথবা মার্গের কোন সুবিবেচক ব্যষ্টির পরামর্শ বা আদেশ নিতে পারে । প্রত্যেক আনন্দমার্গীকে এই নির্দেশ ৰাধ্যতামূলকভাবে মেনে ' চলতে হবে ।

সূচীপত্র

8 নিয়ম - সাধনা

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ যম – সাধনার কথা এর আগেই ৰলেছি । আজকে ৰলৰ নিয়ম – সাধনার কথা । যম – সাধনার যেমন বাকী চারটে অঙ্গের চাইতে ব্রহ্মচর্যের শ্রেষ্ঠতা অধিক , নিয়ম – সাধনায় তেমনি সব চাইতে বেশী মাহাত্ম্য ঈশ্বর – প্রণিধানের । বস্তুতঃ যম – নিয়মের দশটি অঙ্গের মধ্যে আটটি অঙ্গ বাকী দুইটি অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বর – প্রণিধানেরই সাধনাঙ্গ । বৈশিষ্ট্যগত বিচারে যম সাধনা হচ্ছে মূলতঃ লৌকিক ও মানসিক জগতের সাধনা , আর নিয়ম – সাধনা লৌকিক , মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিন জগতেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।

সূচীপত্র

9 শৌচ

নিয়ম – সাধনার প্রথম অঙ্গ হচ্ছে ‘ শৌচ ’ । ‘ শৌচ ’ শব্দের অর্থ পবিত্রতা .... শুচিতা পরিষ্কার – পরিচ্ছন্নতা । এই শৌচ আবার দু’রকমের— একটা লৌকিক জগতের অর্থাৎ বাহ্যিক শৌচ , অপরটি মানসিক জগতের বা আভ্যন্তরীণ শৌচ । “ শৌচত্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা । মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনশুদ্ধিস্তথাত্তরম্ ।। ” জল , মৃত্তিকা বা বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ যার সাহায্যে শরীর , বস্ত্র বা বাসগৃহাদি পরিষ্কার – পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারকে বাহ্যিক শৌচ ৰলা হয় । এই বাহ্যিক শৌচ ক্রিয়ার দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের যে সকল বস্তুর সঙ্গে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত সেগুলো থেকে মলাপসারণ করে সেগুলিকে নির্দোষ ও ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা হয় । প্রবৃত্তির তাড়নায় বিবেকের সাহায্য না নিয়ে মানুষ যখন ভোগ্য বস্তুর পানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তার মানস শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে যায় , অথবা কারো ক্ষতির চিন্তা করে ' বা না করে ’ স্বার্থসম্পৃক্ত ভাবের দ্বারা নিজের মানস দেহকে আবৃত করার অভ্যাস করতে করতে শেষ পর্যন্ত

তাকে জড়বৎ করে তোলে তখন যে গ্লানিগুলোর ফলে মনে এই বিকৃতি ঘটল সেগুলোকে বলা হয় মনের ময়লা । দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ , পরিচিত কেউ যদি কখনও হঠাৎ অধিক পরিমাণ নাম – যশ , বিদ্যা বুদ্ধি বা অর্থ – সামর্থ্যের মালিক হয়ে পড়ে তখন অনেক মানুষের মনেই একটা হিংসার ভাব জাগে । ওই সকল গুণ বা দ্রব্যাদি অর্জন করবার কতটুকু সামর্থ্য তার নিজের আছে সেটুকু না ভেবেই অন্যের উন্নতি দেখে ’ মানস ক্লেশ ভোগ করতে থাকে । এই উন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কালে তার কোন ক্ষতি না করে ' থাকলেও সে হিংসাবৃত্তিতে অন্ধ হয়ে তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করে বা ক্ষতির চিন্তা করে ।

যেখানে স্বার্থবোধে বাধে সেখানে তো কথাই নাই । সে অবস্থায় তথাকথিত সৎ ব্যক্তিরও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মন আবিলতাযুক্ত হয়ে পড়ে । মানুষের গৃহ , বস্ত্রাদি ধূলা – ঝড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মলিন হয়ে যায় , সামান্য একটা প্রবৃত্তির ঝড় তার চাইতে অনেক কম সময়ে তার মানস দেহকে অনেক বেশী মলিন করে ’ দিতে পারে । তাই শরীর বস্ত্র – গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষার প্রয়োজন অত্যধিক হলেও মনকে পরিচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজন তার চাইতেও অধিক । কিন্তু শরীর , বস্ত্র বা গৃহাদি পরিচ্ছন্ন করা যতটা পরিশ্রমসাধ্য মনকে পরিচ্ছন্ন করা বা পরিচ্ছন্ন রাখা তার চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমসাপেক্ষ । তাই বুদ্ধিমান মানুষ

মুহূর্তের জন্যেও নিজের মানসিক শুচিতা নষ্ট হতে দেৰে না । সব সময়েই প্রবৃত্তির ঝড়ের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে থাকতে হৰে । কখনও নিজেকে ঝড়ের মুখে ছেড়ে ’ দিলে চলৰে না । বাহ্যিক শুচিতা ও আভ্যন্তরীণ শুচিতা— এ দু’য়ের মধ্যে আরও একটা ৰড় তফাৎ হচ্ছে এই যে বাহ্যিক অশুচিতা দূর করবার জন্যে নিজেকেও কিছুটা সময়ের জন্যে অশুচিতার পঙ্কে নাৰতে হয় । শরীর , বস্ত্র বা গৃহ পরিষ্কার করবার সময় নিজেকে কিছুটা সময়ের জন্যে বেশী পরিমাণ অশুচি বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হয় , কিন্তু মনঃশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা তাতে নিজেকে অধিকতর শুচি রেখেই সিদ্ধকাম হওয়া যায় । বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ গ্লানি যে ধরণেরই হোক না কেন , তা ’ দূর করতে হলে শক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য । এই শক্তি সম্প্রয়োগের সাহায্যেই গ্লানিকে মূল বস্তু থেকে সরিয়ে ’ মূল বস্তুর স্বরূপটুকু চিনে ' বুঝে নিতে হয় । সোণা থেকে খাদ – পান বাদ দিলে তবেই আসল সোণাটুকুর ওজন ৰোঝা যায় । এই যে শক্তি – সম্প্রয়োগ এটা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ ধরণের ক্রিয়া । এজন্যেই বলতে হয় , বাহ্যিক শৌচ বহিঃকরণিক ক্রিয়া , আর মানসিক শৌচ অন্তঃকরণিক ক্রিয়া ।

যে ক্ষুদ্র স্বার্থৰোধ মানস দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে তাতে বৈবর্ণ আনে , তাকে গুরুতর বোঝায় পরিণত করে ’ দেয়— সেই ক্ষুদ্র স্বার্থের গ্লানিকে দূর করতে গেলে তাকে

সাধনার আগুনে পুড়িয়ে ' গালিয়ে ' ফেলতে হবে । এ ক্ষেত্রে এই সাধনা হবে ক্ষুদ্র স্বার্থগত সাধনার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ কিনা সাধনাটা এমন ধারা হতে হবে যাতে করে ' মনের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে অপবিত্রতার শেষ গ্লানি , শেষ কালিমাটুকুও বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয় । নিঃস্বার্থ ভাব , বিশ্বৈকভাবই মানসিক অপবিত্রতা দূরীকরণের একমাত্র ঔষধ ।

যার যে জিনিসের প্রতি লোভ বা মোহ বেশী , সে তদ্বস্তু সম্বন্ধে বিপরীত ভাব গ্রহণ করেই ধীরে ধীরে এই স্বার্থসঞ্জাত মানস কল্মষ থেকে মুক্ত হতে পারে । যার অর্থের লোেভ প্রবল তার উচিত ধীরে ধীরে দান করবার অভ্যাসকে জাগিয়ে তোলা ও সেই অভ্যাসের মাধ্যমে জনসেবা করা । যার ক্রোধ বা অহঙ্কার প্রবল তার উচিত ধীরে ধীরে বিনয়ী হবার অভ্যাসকে জাগিয়ে তোলা ও সেই অভ্যাসের মাধ্যমে জনসেবা করা । নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা তথা ভূমা দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখার চেষ্টার মাধ্যমে তাই মানুষ মানসশৌচে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

অপরের কাছ থেকে প্রাপ্তির ইচ্ছা মানুষের অনন্ত । কিছুতেই তার আশা মিটতে চায় না । অথচ , অন্যকে দেবার ইচ্ছা খুবই অল্প । সাধারণতঃ মানুষ অন্যকে যখন যেটুকু দেয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়াটা বা সেবাটা একান্তই গৌণভাবে থাকে , মুখ্যভাবে থাকে দানের বিনিময়ে প্রতিদান প্রাপ্তির ইচ্ছা । অথবা , ডান হাতে দান করে '

বাম হাতে যশ কুড়োবার উগ্র লোভ । এই লোভের বৃশ্চিক – জ্বালা থেকে ৰাঁচতে হলে সাধককে তাই এর বিপরীত ভাবেরই অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ কিনা কারো কাছ থেকে প্রাপ্তির ইচ্ছা তিলমাত্র না রেখে’ দেবার ইচ্ছাটাই অনন্ত করে ’ তুলতে হবে । ‘ছোট আমি’র ক্ষুদ্র পিঞ্জরের গারদ ভেঙ্গে ' বেরিয়ে পড়ে ’ অনন্ত নীলিমাতেই মনকে বসাতে হবে ।

“নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো,
আবার কেন ঘরের ভেতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।”

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ , রাগে – দুঃখে অনেক মানুষই ৰলে থাকে যে অমুকের বিপদের সময় এত সাহায্য করলুম , রোগে এত সেবা করলুম , অথচ , দেখ , লোকটা এমন অকৃতজ্ঞ যে আজ আমার এই দুর্দিনে আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না । অভিশাপের ভাষায় হয়তো ৰলে ’ বসে যে ভগবান সব দেখছেন , এ কর্মের প্রতিফল ওকে পেতেই হবে । তোমরা জান , এ জাতীয় উক্তি যা ’ মানুষ প্রায় করে ’ থাকে এগুলো নীচতার অতি কুৎসিত অভিব্যক্তি । এই জাতীয় মানুষেরা মানস শৌচের জন্যে সাধনা করেনি । এরা কারো দুর্দিনে সেবা করেনি বা রোগে সেবা করেনি । আসলে এরা মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মানুষকে কিছু পরিমাণ সাহায্য দাদনস্বরূপ দিয়েছিল , উদ্দেশ্য ছিল পরে ওই

সাহায্য মুনাফার উপযুক্ত অঙ্কসহ সুদে আসলে আদায় করবে ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই শৌচ – সাধনায় মানুষ পরার্থে কতটুকু দান করবে ? সে কি নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই বিকিয়ে ’ দেৰে ? এর জৰাৰে ৰলৰ , সেবাটাই যেখানে লক্ষ্য সেখানে অপরিগ্রহের কথা মনে রেখে ’ নিজের বা নিজের প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলদের (direct dependant) প্রয়োজনের পানে চেয়ে যতটুকু না রাখলে নয় ততটুকু রেখে ’ দিয়ে ৰাকী সবটুকু বিশ্বের সামূহিক কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে , কিন্তু যেখানে কোন আদর্শগত সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে সেখানে নিজের সর্বস্ব , এমনকি শরীরটাও সমষ্টির স্বার্থে বলি দেবার জন্যে সানন্দে ও সাগ্রহে তৈরী থাকতে হবে । গৃহে যার অন্নাভাব সে গৃহবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কিছু পরিমাণ অন্ন রেখে ' দিয়ে ৰাকীটা ' দুঃস্থকে দেৰে । এখানে গৃহবাসীর প্রয়োজনের দিকে চাওয়াটা সঙ্কীর্ণতা বা নীচাশয়তা নয় , কারণ সমাজ জীবনে বা এই বাস্তব জগতে বেঁচে থাকাটা একমাত্র কথা না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা । কিন্তু যেখানে সংগ্রামটা সম্পূর্ণরূপে আদর্শগত , যেখানে পরাজয় স্বীকার করার অর্থ ঘোর অন্ধকারে স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত হওয়া অর্থাৎ কিনা যেখানে অন্ধকারের হাত থেকে পরিত্রাণের সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও মনে জাগে না , সেখানে আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যে নিজের সর্বস্ব ৰিলিয়ে

দিতেই হবে ও এই ধরণের অবস্থার জন্যে সশস্ত্র সৈনিকের মত মনকে সদাসর্বদাই তৈরী করে ’ রাখতে হবে ।

সূচীপত্র

10 সন্তোষ

‘তোষ’ শব্দের অর্থ মনের আরামের অবস্থা , আর ‘সন্তোষ’ – এর অর্থ তাই মনের সম্যক রূপে আরাম । সাধারণ অবস্থায় মানুষের মন আরাম বা তৃপ্তি জিনিসটা ৰড় একটা পায় না । মন যেখানে ভোগাভিমুখী বৃত্তি নিয়ে জড়ের পানে কুকুরের মত ছুটে চলেছে সেখানে কোন কিছুতে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভবও নয় । তার ভোগ্য বস্তু ক্রমবিশ্লেষণের ফলে সংখ্যা ও ভাবের দিক দিয়ে ক্রমশঃ ৰেড়েই চলে , আর তাই মনের ছুটে ’ চলাও শেষ হয় না । এ অবস্থায় আরামের বিস্তৃতি সে কী করে পেতে পারে ? কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে এক – আধ ঘন্টার জন্যে কিছুটা আরাম হলেও হতে পারে , কিন্তু তারপর মন তাকে পেছনে ফেলে ’ রেখে ’ অন্য কোথাও ছুটে ’ যেতে চাইৰে ও বহু দিনের কাম্য বস্তু ও তার সমস্ত মিষ্টতা হারিয়ে ’ ফেলৰে , —এইটেই নিয়ম , এইটেই স্বভাব । .মানুষের ক্ষুধার শেষ নেই । লক্ষপতি কোটিপতি হতে চায় , কারণ সে লক্ষ টাকা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট নয় । কোটিপতিকে জিজ্ঞাসা কর টাকা পেয়ে সে কি সুখী , সে ৰলৰে — টাকা আর কোথায় ! কোন রকমে দিনগুলো

কেটে ’ যাচ্ছে । এগুলো যদিও অপরিগ্রহ – বোধের অভাবেই সূচিত করে তবুও এই অপরিগ্রহবিরোধী ভাব দেহ ও মনের ওপর আরেক ধরণের কুপ্রভাব বিস্তার করে । সেটা হচ্ছে , শরীর বা মনের অত্যধিক ভোগলালসায় উন্মত্ত হয়ে মানুষ উন্মাদের মতই অর্থোপার্জনে বা অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় । তার ফলে টাকাই জীবনের সর্বস্ব হয়ে যাওয়ায় মন হয়ে যায় জড় আর দীর্ঘ কালের অবজ্ঞার ফলে শরীর হয়ে পড়ে অপটু । তাই স্বাভাবিক পরিশ্রমে অর্থাৎ শরীর ও মনের ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে যে অর্থ বা সম্পদ উপার্জন করা যায় তাতে তৃপ্ত থাকার নামই সন্তোষ সাধনা । এই তৃপ্ত থাকার প্রচেষ্টা হিসেৰে মানুষকে একটা বিশেষ ধরণের মানস প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে যে প্রচেষ্টা তাকে সর্বদাই অতি লোভাত্মক কাজগুলি থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে । তোমরা জান , মনকে যে কোন বৃত্তি থেকে দূরে সরাবার পক্ষে দু’টি প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ— একটি স্বগত অভিভাবন (auto – sug gestion) ও অপরটি পরগত অভিভাবন (outer – suggestion) । যার মন যে হীন বৃত্তিতে রত সে যদি ঠিক সেই বৃত্তিবিরোধী ভাবধারা মনে মনে অহরহঃ জপতে থাকে তাহলে তার স্বভাবগত পরিবর্তন আসতে ৰাধ্য— এটাই স্বগত অভিভাবন । আর কেউ যদি বার বার তার কাণে সেই ধরণের কথা শুণিয়ে যেতে থাকে তাহলে তার স্বভাবগত পরিবর্তন আসে— এটাকেই বলি

পরগত অভিভাবন । সন্তোষ সাধনায় সাধক সব সময়েই স্বগত অভিভাবনের সাহায্য নেবে । – সন্তোষ – সাধনের এ উদ্দেশ্য নয় যে কেউ তোমাকে কোন প্রকারে ঠকিয়ে বা তোমার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তোমার ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাবে , আর তুমি মুখ বুজে ’ তা ’ সয়ে ’ যাবে । তোমার অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার , তোমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডার দাবী কোন ক্রমেই ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত হবে না । জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সব সময়েই তোমাকে মিলিতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে ’ যেতে হবে , কিন্তু কখনও অতিলোভের বশবর্তী হয়ে নিজের শারীরিক তথা মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে ’ সন্তোষ ভাবের বিরুদ্ধে যেও না ।

সূচীপত্র

11 তপঃ

‘ তপঃ ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রসিদ্ধির জন্যে কৃচ্ছ্র সাধনা । শৌচ সাধনায় তোমাকে জনহিতার্থে ক্লেশ বরণ যে করতেই হবে এমন কোন কথা নেই । যে লক্ষপতি তার পক্ষে দশ টাকা দান করা আদৌ কৃচ্ছ্রসাধন নয় , সুতরাং তপও নয় । কিন্তু এই দশ টাকা দানও তার মানসিক

শৌচবিধানে সাহায্য করে । তপঃসাধক আর তাপসের এই যে তপস্যা , এই যে স্বেচ্ছায় ক্লেশবরণ – এর পেছনে একটিই উদ্দেশ্য থাকবে , আর সেটা হচ্ছে নিজের ঘাড়ে ক্লেশ – দুঃখের বোঝা নিয়ে অন্যকে দুঃখ থেকে , ক্লেশভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া— অন্যকে আরামে রাখা ।

শৌচ সাধনার মত তপঃসাধনাতেও তিলমাত্র বৈবসায়িক মনোভাব নিয়ে থাকলে চলবে না । শূদ্রোচিত সেবা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তপঃ পর্যায়ভুক্ত । তাই যে শূদ্রত্বকে ভয় পায় , শূদ্রকে ঘৃণা করে তার পক্ষে তাপস হওয়া কোন কালেও সম্ভব নয় । একজন রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে— তুমি তার আরামের পানে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি সেবা করে ' যাও এটা হ'ল তপঃ । কিন্তু তুমি যদি স্বার্থসম্পৃক্ত মনোভাব নিয়ে ভাব , এর দুর্দিনে আমি সেবা করলুম , আমার দুর্দিনে এ'ও করবে , তাহলে এক মুহূর্তেই তোমার সমস্ত তপস্যাই নষ্ট হয়ে গেল । তাহলে বুঝছ , তপঃসাধনা হচ্ছে শরীর ও মনকে স্বার্থসচেতনতার বাইরে নিয়ে যাওয়া । স্বাভাবিক নিয়মে তাই তপঃ সাধনায় মানসিক ব্যাপকতা আসতেই হবে । আর এই ব্যাপকতায় নিশ্চয়ই সাধককে তার ঈশ্বর প্রণিধান সিদ্ধিতে বিপুল ভাবে সাহায্য করবে । তপঃসাধক জানে সেব্য তাঁরই ইষ্ট , সেব্য ব্রহ্ম ; সে সেবক আর সেবাই তার সাধনা । সেব্যের জাতি – কুল – বর্ণ – ধর্ম – দেশ বা মত বিচার করে যে সেবায় নাবে তার

তপস্যাও ব্যর্থ হয় , কারণ সে ধরণের সাধকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন – বেদ মানসিক উদারতার অভাব থাকায় সেবাও ঠিক নিষ্ঠার সঙ্গে করা সম্ভব হয় না । সেব্যকে যে ব্রহ্মের বিকাশ মাত্র রূপে দেখেছে , নিঃস্বার্থ ভাবে যে তার আরাম বিধানে রত হয়েছে ব্রহ্মপ্রেম বা ভক্তিও অত্যল্পকালের মধ্যেই তার অন্তরে জেগে ’ ওঠে । প্রেম যেখানে জাগল , ভাব যেখানে স্ফুর্ত হ’ল সেখানে আর বাকী রইল কী !

এই তপঃ সাধনায় জ্ঞানের বা বিচারের স্থান কতটুকু , এটা একটা . গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । আসলে শৌচ সাধনের অঙ্গ হিসেৰে জনসেবায় জ্ঞানের প্রয়োজন যতখানি তপের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত জনসেবায় জ্ঞানের প্রয়োজন তার অনেক বেশী । তপঃ জ্ঞানবর্জিত হ’লে তার অপব্যবহার হতেই হবে । সুবিধাবাদীরা তোমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে ’ এক দিকে তোমার শক্তির অপচয় ঘটাৰে , অন্যদিকে প্রকৃত দুঃস্থ জনকে তোমার কাছ থেকে প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করে ’ রাখৰে । একজন বিত্তশালী কৃপণ তোমার কাছে এসে ’ যদি নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে ’ কাকুতি – মিনতি করে ও তাকে ক্লেশ থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি যদি যথোচিত পরিশ্রম করে ’ তার জন্যে আর্থিক বা কায়িক সেবার ব্যবস্থা , কর সেক্ষেত্রে তোমার তপঃ জ্ঞানবর্জিত বা বিচারবর্জিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে যাবে , কারণ প্রথমতঃ ওই সেবাপ্রাপ্ত ধনী অধিকতর কৃপণ ও অধিকতর স্বার্থপর হয়ে যাবে ও

পরবর্ত্তীকালে সে সেবাব্রতীগণকে আরও বেশী পরিমাণে ঠকাবার চেষ্টা করবে ; দ্বিতীয়তঃ তার স্বরূপ কিছুটাও জেনে ’ ফেলবার ফলে তোমার মনেও একটা গ্লানি জাগৰে , তুমি তার প্রতি কিছুটা শত্রুমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে । তাই তপের অনুশীলন করবার সময় যার সেবা করে ’ যাচ্ছ তার সত্যিকারের সেবার প্রয়োজন আছে কি না সেটা বিশেষ রকমে ভেবে ’ জেনে ’ নিয়ে সেবার কাজে নাৰা দরকার ।

তপঃ সাধনাকালে সব সময়েই নীচের দিকে তাকাবে— ওপরের দিকে নয় । যারা তোমার চেয়ে দুর্বল , তোমার চেয়ে দরিদ্র , তোমার চেয়ে অশিক্ষিত , অজ্ঞ ও অবহেলিত তাদের প্রতিই তোমার দায়িত্ব সমধিক । যারা তোমার ওপরতলাকার মানুষ অর্থাৎ ৰেশী ধনী বা ৰেশী শক্তিশালী তাদের সম্বন্ধে তোমার দায়িত্ব অনেকখানি কম । তাই কোথায় তোমার দায়িত্ব কতখানি সেটা জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝে ’ নিতে হৰে । অন্যথায় তপে নিযুক্ত সময় , সামর্থ্য ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যাৰে । ধনীদের জন্যে পার্টি দিয়ে লাভ নেই , অন্নহীনকে অন্ন দাও । ওপর ওয়ালার বাড়ীতে ভেট পাঠিয়ে লাভ নেই , রোগীর বাড়ীতে ঔষধ - পথ্য পাঠিয়ে দাও । অবস্থাপন্নকে খোসামদি করে ’ সময় নষ্ট করে ’ লাভ নেই , সহৃদয়তার মধুরতায় দুঃস্থের মনকে জয় করে ’ তাকে তোমার সমাজের মাঝে টেনে ’ নাও ।

তপঃ যেখানে জ্ঞানবর্জিত তার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে পেতে পার না , কারণ সেক্ষেত্রে তোমার ক্রিয়ায় বস্তুর উপযুক্ত ব্যবহার হয় না । অবশ্য জ্ঞানবর্জিত তপঃ কিছু না – করার চাইতে কিছু করা হিসেবে ভালই । অনেক সময় মনস্তাত্বিক আবেদন হিসেৰে এতে মন্দ ফল হয় না । ৰুদ্ধ বলেছেন— “জিনে কদরিয়ং দানেন , সচ্চেন অলীকবাদিনম্ ।” কৃপণের সামনে নিজের দান দেখিয়ে তাকে প্রভাবিত করা অবশ্যই যায় । সেটা কোন খারাপ জিনিসও নয় । তবে নিয়ম – সাধনায় তপঃ ৰলতে যা’ ৰোঝায় এতে সেটা ঠিক হ’ল না ।

তপের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে । সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে যতক্ষণ জ্ঞানের অভাব থাকে ততক্ষণ সে তার কর্মশক্তিকে প্রবৃত্তিমূলক কার্যেই নিয়োজিত করে । জ্ঞানযুক্ত তপঃ এই কর্মধারার মোড় ঘুরিয়ে দেয় , তাকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে । অবশ্য ভুক্তিতেও জ্ঞানের উদয় হয় কিন্তু এই ভক্তি জিনিসটা , যে অন্তরে তাঁর কৃপা উপলব্ধি করেনি, তার হৃদয়ে জাগা অসম্ভব ।

সূচীপত্র

12 স্বাধ্যায়

কোন জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ৰুঝে ’ নেওয়ার নামই স্বাধ্যায় । প্রাচীনকালে ঋষির আশ্রমে শিক্ষার্থীরা এভাবেই তাদের দৈনন্দিন স্বাধ্যায় করে ' যেত । কিন্তু অবস্থা আজ পাল্টেছে , কালের কুটিল গতিতে আজ স্বাধ্যায়ও তার তাৎপর্য হারিয়ে বসেছে । এখন অর্থ না ৰুঝে ’ শাস্ত্রপাঠ করলেই স্বাধ্যায় হয় । ধর্মব্যবসায়ীরা জানিয়ে দিয়েছেন , অমুক . পুস্তক পাঠের ফল এই — অর্থ ৰোঝা বা না – ৰোঝা সেটা কোন ৰড় কথা নয় । পুস্তক পাঠের সময় যদি না পাও , পুস্তকটিকে তিনবার মাথায় ছুইয়ে দাও , অথবা হরিকথা শোণৰার বা ৰোঝৰার সময় বা সামর্থ্য যদি নাও থাকে , দেবোদ্দেশ্যে কিছু ফল , বাতাসা বা অর্থ নিবেদন করে ’ দাও— তাতেই ফল হৰে । যাই হোক , আসল জিনিসটি নিয়েই তোমাদের কাজ ।

স্বাধ্যায়ের অর্থ হ’ল শব্দের গূঢ়ার্থ বুঝে’ নেওয়া । লৌকিক অর্থকে পুঁজি করে’ নেওয়ার ফলে শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধনায় যথেষ্ট আবিলতা এসে’ পড়েছিল, আর তা’ শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের ধর্মবোধের ওপরও বড় রকমের আঘাত হেনেছিল । যেমন ধর , তন্ত্রে পঞ্চ ম – কার সাধনার একটি অঙ্গ হচ্ছে মাংস সাধনা । এই মাংস সাধনা জিনিসটা কী ?

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে ।

যো তদ্ ভক্ষয়েন্নিত্যং স এব মাংসসাধকঃ ।"....তন্ত্র

অর্থাৎ ' মা ' শব্দের অর্থ জিহ্বা , আর তাই ' মাংস ' শব্দের অর্থ জিহ্বার কার্য অর্থাৎ কিনা বচন । যে সাধক এই বচনকে নিত্য ভক্ষণ করে অর্থাৎ কিনা বাক্ – সংযম অভ্যাস করে সে–ই মাংস – সাধক । অর্থটি কত সুন্দর ! কিন্তু লৌকিক অর্থগ্রাহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যষ্টিরা মাংস–সাধনার উদ্দেশ্যে নিরীহ ছাগশিশুকে ৰধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না । খাবার লোকের সংখ্যা বুঝে' ৰলির পাঁঠার সংখ্যাও নির্দ্ধারিত হয় । হায় রে সাধনা !

শাস্ত্রোল্লিখিত কোন কিছুরই গূঢ়ার্থ বুঝতে হলে বাক্যের ভাবটুকু প্রথমে ঠিক ভাবে ৰুঝে ' নিতে হবে , অন্যথায় তার থেকে অর্থ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না । যদি ৰলি , "শৌণ্ডিকঃ সুরালয়ং গচ্ছতি", তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই সুরালয়ের অর্থ নিতে হৰে আসব–বিপণি । কিন্তু যদি ৰলি "নারদঃ সুরালয়ং গচ্ছতি" সেক্ষেত্রে সুরালয়ের অর্থ মদ্যালয় নিলে ভুল করা হবে । এ জায়গায় সুরালয়ের অর্থ সুরার আলয় নয় , সুরের আলয় অর্থাৎ স্বর্গ । তাহলে বুঝলে , স্বাধ্যায়ের জন্যে কতটা সতর্কতার প্রয়োজন । কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রায়ই জনসাধারণকে গূঢ়ার্থ থেকে দূরে রাখতে চায় , কারণ তাতেই তাদের শোষণের সুবিধা ।

সূচীপত্র

13 ঈশ্বর - প্রণিধান

'ঈশ্বর' শব্দের অনেক অর্থ হতে পারে । তবে শব্দটির মোটামূটি অর্থ হ'ল নিয়ন্তা । এ বিশ্ব – কল্পনাকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই ঈশ্বর । সুতরাং ঠিক পুরুষোত্তম ৰলতে যা ' ৰোঝায় ঈশ্বর ঠিক সেই জিনিস নন । দার্শনিক ভাষায় ' ঈশ্বর ' শব্দের আরও অর্থ রয়েছে । সেটা হচ্ছে তমোপ্রধান প্রকৃতির অভিমানী পুরুষ যিনি কারণার্ণবের সাক্ষী , যিনি প্রাজ্ঞের ভূমাভাব । সর্বন্ধনমুক্ত পুরুষকেও দার্শনিক ভাষায় ' ঈশ্বর ' ৰলা হয়—

"ক্লেশ–কর্ম–বিপাকাশয়ৈরপরাসৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

ছোটখাট দার্শনিক মতভেদ ওখানে যা–ই থাক না কেন , সাধকের দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলতে সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবান ছাড়া আর কেউই নন । 'প্রণিধান' শব্দের অর্থ সম্যক্ রূপে ৰোঝা বা কোন কিছুকে নিজের আশ্রয় রূপে গ্রহণ করা । সুতরাং ঈশ্বর – প্রণিধানের অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঈশ্বর ভাবেতে নিজেকে স্থির করা — ঈশ্বরকে জীবনের একমাত্র আদর্শ রূপে গ্রহণ করা । পাঞ্চভৌতিক উপাদানে প্রস্তুত তোমার এই স্থূল দেহ ঈশ্বরীয়

কল্পনার সঞ্চর বা প্রতিসঞ্চর ভাবের বিরুদ্ধে যায় না; যায় তোমার মন , আর তার ফলে জীবাত্মার হয় অধোগতি কারণ জীবাত্মা মনেতেই প্রতিবিম্বিত । “ ঈশ্বর - প্রণিধান ” জিনিসটাও তাই দাঁড়াচ্ছে– মনকে সেই পরমাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর পানে ছুটিয়ে নিয়ে চলা । তাই ঈশ্বর - প্রণিধান জিনিসটা সম্পূর্ণ ভাবাশ্রয়ী— সম্পূর্ণতই একটা মানস প্রচেষ্টা । এতে চীৎকার করে ’ লোক জড় করবার বা ঢাক - ঢোল পিটিয়ে ’ ভক্তি দেখাবার কোন অবকাশ নেই । তোমার ঈশ্বর ৰধির নন যে চীৎকার করে ' তাঁর কাণে তোমার মনের ভাষা পৌঁছিয়ে দিতে হবে ।

ঈশ্বরের এই যে ভাব নেওয়া এতে মনকে প্রথমে বস্তুতান্ত্রিক প্রপঞ্চ থেকে সরাতে হয় , তার পরে সরাতে হয় ক্ষুদ্র - আমিত্বের স্বার্থসচেতনতা থেকে , তারপরে সেই বিন্দুভূত মনের সামনে বিরাটের ভাবকে তুলে ’ ধরে ’ নিজের সংস্কার অনুযায়ী বর্ণ - প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রে তাঁর ভাব নিতে হয় । তিনি সহজ সত্তা । তাই কেবল ভাবেতেই তাঁকে পাওয়া যায়— আর কোন কিছুতে নয় ।

তোমরা অনেকেই হয়তো জান , জপ তিন প্রকার বাচনিক , উপাংশু ও মানসিক । পূর্বেই ৰলেছি , বাচনিক জপ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাঁকডাক করে ’ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা একেবারেই অর্থহীন । শ্রদ্ধা - ভালৰাসা , নিষ্ঠা - ভক্তি অন্তরের জিনিস — চাটুকারের বাঁধাধরা ভাষায় হাঁক

– ডাক করে ’ জানাবার জিনিস নয় । তাই বাচনিক জপ অর্থহীন । তবে হ্যা , অন্তরের ভাব বা আনন্দ যেখানে মুখ ফুটে ’ জানাবার ইচ্ছা জাগে সেখানে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় তথ্য সরস ভাষায় শ্লোকে বা গানে অবশ্যই জানানো যেতে পারে । দৃষ্টান্তস্বরূপ , “ ওঁং নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ” মন্ত্রটির কথা মনে পড়ে । এইটি বা এই ধরণের মন্ত্রগুলি খুব ভাল , কিন্তু এতে জপের বা ঈশ্বর – প্রণিধানের কাজ হয় না ।

মন্ত্র যেখানে অস্ফুট স্বরে ওষ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে তখন তাকে ৰলা হয় উপাংশু জপ । এই জপ বাচনিক জপের চাইতে ভাল হলেও আদর্শ রূপে গণ্য হবার যোগ্য নয় ।

ঈশ্বর – প্রণিধানে মানসিক জপই সর্বশ্রেষ্ঠ । মন যাঁর ভাব নিচ্ছে , মনই সেই ভাব উচ্চারণ করৰে , মনই সেই ভাবের কথা শুণে ’ যাৰে । এই মানসিক জপ উপযুক্ত পাত্রের কাছ থেকে যথাবিধি শিখে ’ নিয়ে নিয়মতিরূপে যথাবিধি অভ্যাস করলে অল্প দিনের মধ্যেই মন একটি বিশেষ ধারাপ্রবাহে এগিয়ে যেতে থাকৰে । এই এগিয়ে যাওয়াটা হ’তে থাকে ব্রহ্মেরই প্রতিসঞ্চরের পথ ধরে ' । তবে প্রতিসঞ্চরের পথে যে মানসগতিতে তিনি কল্পনাসমূহকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন সাধকের এই ঈশ্বর প্রণিধান – সঞ্জাত মানসগতির বেগ তার চাইতেও দ্রুত ।

ব্রহ্মকল্পনার প্রতিসঞ্চরের পথ ধরে ’ সাধকের মন যখন এগিয়ে যেতে থাকে তখন তার দেহস্থ শিবত্বের সম্ভাবনাযুক্ত জীবশক্তিও সকল বৃত্তির সকল সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে ’ দিব্যলোকের পানে এগিয়ে যেতে থাকে । এই অবস্থায় সাধকের মন – প্রাণ ব্রাহ্মী প্রতিসঞ্চরের স্পন্দনে স্পন্দিত হ’তে থাকে । ঊর্ধ্বতর গ্রন্থিতে অব্যক্ত দৈব গুণগুলি পরিস্ফুট হ’তে থাকে , আর মনের স্পন্দন স্নায়ুপুঞ্জকেও স্পন্দিত করে ’ দেহেতেও সাত্বিক লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলে । যাদের এই সাত্বিক লক্ষণগুলি স্নায়ুগত কারণে দেহে ফুটে ’ ওঠে না তাদের মানসিক স্পন্দনের ফলে দেহের কয়েকটি গ্রন্থিতে ৰড় রকমের পরিবর্তন এসে ’ যায় । এই সাত্বিক লক্ষণ বা ভাব মূলতঃ আট প্রকারের — স্তম্ভ , কম্প , স্বেদ , স্বরভেদ , অশ্রু , রোমাঞ্চ , বৈবর্ণ ও প্রলয় । এই সাত্বিক ভাবগুলির আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি ভাব আছে— যেমন নৃত্য , গীত , বিলুণ্ঠন , ক্রোশন , হুঙ্কার , লালাস্রাব , দৃম্ভণ , লোকাপেক্ষা – ত্যাগ , অট্টহাস , ঘূর্ণন , হিক্কা , তনুমোটন ও দীর্ঘশ্বাস ।

বাচনিক ও উপাংশু জপে এ জাতীয় লক্ষণ ফুটে ’ ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম । সাধনার পথ যে ঠিকভাবে জেনেছে বা পেয়েছে তার মধ্যে এই লক্ষণগুলি ফুটে ’ ওঠা খুৰই স্বাভাবিক । এতে ক্লেশ নেই , আনন্দ আছে । আর তাই সাধকদের এতে অযথা ভয় পাওয়া উচিত নয় ।

সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি যখন ফুটে ’ ওঠে সেই সময় সাধকেরও উচিত নয় এগুলি সম্বন্ধে কোন চিন্তা করা । ভাবগ্রস্ত অবস্থায় সাধক যদি ভাবলক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলার দিকে নজর দিয়ে ফেলে তাহলে তার অগ্রগতি ৰাধাপ্রাপ্ত হয় । ভাবলক্ষণগুলিকে যদি সে চেপে ’ রাখবার চেষ্টা করে তাহলে তার ভাবই নষ্ট হয়ে যায়— ঈশ্বর – প্রণিধান থেকে মন সরে ’ যায় । সব সময়েই মনে রাখা দরকার , ব্রহ্মভাবটাই সৰ চাইতে ৰড় কথা— ভাবলক্ষণগুলির দিকে নজর দিতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

ঈশ্বর – ভাবনা থেকে মনকে সরাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হয়ে যায় । তবে সাধক যখন দীর্ঘকালের জন্যে ঈশ্বর – ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয় তখন ওই ভাবগুলি কেবলমাত্র মানসিক দেহে ক্রিয়া করে , স্থূল দেহ তখন অনেকটা শান্ত হয়ে যায় ।

সাধনার অন্যান্য অঙ্গ নির্জনে এককভাবে অনুশীলন করাই বাঞ্ছনীয় । কিন্তু ঈশ্বর – প্রণিধান একক ও মিলিত উভয় ভাবেই করা যায় । মিলিত ঈশ্বর – প্রণিধানে সকলের যৌথ মানস প্রচেষ্টা এক সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করে বলে ’ উন্নত ভাবলক্ষণগুলিও অত্যল্পকালের মধ্যেই স্ফূর্ত্ত হয় । তাই অন্যান্য সাধনার ন্যায় ঈশ্বর – প্রণিধানও এককভাবে তো করবেই , তাছাড়াও যখনই কয়েকজন সুবিধাজনক ভাবে একত্রিত হৰে , মিলিত ঈশ্বর – প্রণিধান করে ’ নেবার

সুযোগ ছেড়ো না । এই মিলিত ঈশ্বর – প্রণিধানের ফলে যে দুর্দমনীয় মনঃশক্তি জেগে ’ ওঠে তা ’ ছোট – বড় পৃথিবীর যে কোন সমস্যার সমাধানে তোমাদের সাহায্য করবে । ঠিক এই কারণে সাপ্তাহিক ধর্মচক্রে নিয়মিত রূপে অংশগ্রহণের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থেকো ।

.........আনন্দ পূর্ণিমা , ১৯৬৩

[পিছনের মলাটের লেখা]

মানুষের চলার পথের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয় হচ্ছে সাধুতা, সরলতা ও তেজস্বিতা। জীবনের কোন স্তরেই সাধুতার মান ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না, ধর্মরক্ষার্থে সংগ্রামকাল ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কূটনীতিকে বা অসরলতাকে প্রশ্রয় দেখে না অর্থাৎ অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই দণ্ড-প্রণামের মতই নিজেকে সরল রাখবে আর লক্ষ্য রাখবে যাতে তোমার তেজস্বিতার অগ্নি কিছুতেই পাংশুপুঞ্জে ঢাকা পড়তে না পারে।

ভাবজড়তায় সাধুতা, সরলতা তেজস্বিতা এই তিনের কোনটাই নেই........তাই তাকে কঠোরভাবে পরিহার করে’ চলবে।

সমাপ্ত

**************X***************

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী – পুরুষ, জাত পাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায় লাগানো উচিত না । আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন । যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা অনুশীলন না করে তাহলে তার কিছুই লাভ হয় না । ঠিক তেমনি সাধনা শিখে

যদি কেউ তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হবে না ।

মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হল অনন্ত সুখ তথা আনন্দ লাভ করা। সাধনা'ই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

সূচীপত্র